বৈচিত্র্যময় সমাজ
অফুরন্ত সম্ভাবনা

বৈচিত্র্যময় সমাজ
অফুরন্ত সম্ভাবনা

প্রতিবেদন
নাঈমা আকতার
শানজিদা আক্তার

সম্পাদনা
সাইফুদ্দিন আহমেদ

প্রচ্ছদ
সাইফুদ্দিন আহমেদ

প্রকাশকাল
মার্চ ২০২০

অলংকরণ
গোপাল সরকার

মুদ্রণ
আইমেক্স মিডিয়া লিঃ

দল প্রধান
দেবরা ইফরইমসন, আঞ্চলিক পরিচালক, হেলথব্রিজ-কানাডা

কারিগরি উপদেষ্টা
সাইফুদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

গবেষণা দল
ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
গাউস পিয়ারী, পরিচালক
সৈয়দা অনন্যা রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার
মারুফ হোসেন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার
নাজনীন কবির, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
জিয়াউর রহমান, সিনিয়র প্রোজেক্ট অফিসার
সৈয়দ সাইফুল আলম, মিডিয়া এডভোকেসি অফিসার
মোঃ আতিকুর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা
সামিউল হাসান সজীব, প্রকল্প কর্মকর্তা

দি ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীং বাংলাদেশ
আ ন ম মাছুম বিল্লাহ ভূঁইয়া, সহকারি পলিসি অফিসার

মাঠ গবেষক
শানজিদা আক্তার, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা
মোঃ মিঠুন, সহকারি নেটওয়ার্ক কর্মকর্তা
তালুকদার রিফাত পাশা, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা
লুৎফুন নাহার মুন্নি, ইন্টার্ন
হৃদয় রতন আচার্য্য, ইন্টার্ন

তথ্য সংরক্ষণ
শানজিদা আক্তার

ছবি সংগ্রহ
সামিউল হাসান সজীব, প্রকল্প কর্মকর্তা
আমিনুল ইসলাম রিপন, লজিস্টিক অফিসার

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

এ গবেষণা কার্যক্রমটি অনেক ব্যক্তি ও সংগঠনের সহযোগিতা ও অবদানে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), অদম্য ফাউন্ডেশন, এইড ফাউন্ডেশন, সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইস্ড (সিআরপি), আইসিডিডিআরবি, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)-এর কর্মকর্তাবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া ডিজেবল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা মর্জিনা আক্তার, প্রতিবন্ধী নাগরিক সংগঠনের পরিষদ (পিএনএসপি)-এর সাধারণ সম্পাদক সালমা মাহবুব, নারীপক্ষ-এর প্রকল্প পরিচালক সামিহা আফরিন, উদ্যোক্তা অনন্যা বণীক এবং সরকারের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কার্যক্রমের পরামর্শক ভাস্কর ভট্টাচার্য্যকে তাদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সর্বোপরি হেল্‌থব্রিজ কানাডার আঞ্চলিক পরিচালক দেবরা ইফরইমসনকে এ গবেষণার তহবিল এবং সহযোগিতা ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে, সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রতিবেদনটিতে হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বর্তমান কর্মসংস্থান পরিস্থিতি ও এ বিষয়ে তাদের প্রত্যাশা বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের কঠোর জীবন সংগ্রামের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা করছি এই প্রতিবেদনটি আমাদের সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন এবং হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখবে।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ---------- ০৭
২. গবেষণার উদ্দেশ্য ---------- ০৭
৩. গবেষণা প্রশ্ন ---------- ০৮
৪. গবেষণা পদ্ধতি ---------- ০৮
৫. আইন ও নীতিমালা ---------- ০৯
৫.১ জাতীয় আইন ও নীতিমালা ---------- ০৯
৫.১.১ বাংলাদেশের সংবিধান ---------- ০৯
৫.১.২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ ---------- ০৯
৫.১.৩ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ---------- ০৯
৫.২ আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালা ---------- ০৯
৫.২.১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ---------- ০৯
৫.২.২ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্র ---------- ১০
৫.২.৩ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আর্ন্তজাতিক চুক্তি ---------- ১০
৫.২.৪ বিবিধ ---------- ১০
৬. সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণ ---------- ১০
৭. ফলাফল ---------- ১২
৭.১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জরিপের ফলাফল ---------- ১২
৭.২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের জরিপ ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ---------- ১৮
৭. হিজড়া ব্যক্তিদের জরিপের ফলাফল ---------- ২১
৭.৪ হিজড়া ব্যক্তিদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের জরিপ ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ---------- ২৭
৭.৫ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ---------- ৩০
৭.৬ ফোকাস গ্রুপ আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী ---------- ৩০
৮. হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ ---------- ৩০
৯. বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মতামত ---------- ৩৬
১০. সফলতার গল্প ---------- ৩৮
১১. সফল হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক উদাহরণ ---------- ৩৯
১২. সুপারিশমালা ---------- ৪০
১৩. সার্বিক আলোচনা ---------- ৪২
১৪. উপসংহার ---------- ৪৩
১৫. তথ্যসূত্র ---------- ৪৪

১. ভূমিকা

সামাজিক বৈচিত্র্যতা বলতে বোঝায় সমাজে সকল মানুষের স্বাধীন, নিরাপদ এবং সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজে বসবাসরত প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্বাধীনতা অর্জনের ৪৮ বছর পর বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ আমাদের দেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু সমাজের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অধিকার নিশ্চিত না হওয়ায় সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা এখনও সফল হতে পারিনি। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রণয়ন এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের স্বীকৃতি প্রদান করা হলেও তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯ (১) ও ২৮ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সকল ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা বিধানের কথা বলা হয়েছে। তা স্বত্বেও দেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তির প্রতিবন্ধীতা নয়, বরং সামাজিক এবং অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাই তাদের পথ চলায় প্রধান অন্তরায়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের অন্যতম প্রতিপাদ্য হচ্ছে-কাউকে পিছনে ফেলে রাখা যাবে না। উন্নত দেশগুলোতে সমাজের পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের উন্নয়নে কতিপয় বাস্তবমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলেও উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে দৃশ্যমান কোন পরিবর্তন নেই। সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে সমান অধিকারের কথা বলা হলেও দেশের বাস্তব প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ মানুষগুলোর অধিকার সুরক্ষা ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য সকল মৌলিক ও প্রয়োজনীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও কার্যত এসবের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয় না। ফলে তাদের সংকটও দূরীভূত হয় না এবং ক্রমশই সমাজের মূল ধারা থেকে তারা পিছিয়ে পড়ছেন।

সমাজের সকল স্তরের মানুষ হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ না করলেও বেঁচে থাকার তাগিদে বিভিন্ন অসুবিধা স্বত্বেও জীবিকার জন্য তারা বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত আছেন। তাদের প্রতি নেতিবাচক ধারণা ও আচরণের পরিবর্তন করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তাদের জীবন ধারণ অনেক সহজ হয়ে উঠবে। ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীং এর উদ্দেশ্য হলো হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে তারা অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হয় এবং একটি সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

সমাজের প্রতিটি মানুষ সমান মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু আমাদের সমাজে বেশির ভাগ মানুষের মধ্যেই হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি নেতিবাচক ও অবহেলাসম্পন্ন মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা যথেষ্ট না হওয়ায় তারা এগুলোর যথার্থ সুবিধা পাচ্ছেন না।

হিজড়া ব্যক্তিদের তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি প্রদানের পর তাদের স্মার্টকার্ড প্রাপ্তি, সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে হিজড়াদের অন্তর্ভূক্তি, ভোটাধিকারসহ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতি মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয়নি। তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে সরকার স্বীকৃতি দিলেও অন্যান্য মানুষের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়নি বরং ক্রমাগত তারা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের শিকার হচ্ছেন। নিজ পরিবারেও তারা অনাদৃত। বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইনে এখনো নারী-পুরুষের সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারও হতে পারেন না। শিক্ষা, কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের পথে তারা পিছিয়ে আছেন বহুগুণে। ফলে প্রায় কেউই কোন সম্মানজনক পেশার সাথে সম্পৃক্ত হতে না পেরে বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েন।

অন্যদিকে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ পাশ হয়েছে। কিন্তু এ মানুষগুলোর অধিকার ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সেভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছুটা সফলতা লাভ করলেও চাকরি বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন। আমাদের সমাজে একটি কুসংস্কার রয়েছে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোন কাজ করতে সক্ষম নয়। তাদের প্রতি আস্থা না থাকায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিয়োগে আগ্রহী হয় না। আবার কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেলেও প্রবেশগম্যতার অভাব, সহকর্মীদের বিরূপ আচরণ এবং প্রতিষ্ঠানের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে তারা ঝরে পড়েন।

হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি/কর্মসংস্থানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং তাদের জীবন মান উন্নয়ন ও জীবন ধারণের জন্য চাকরির প্রয়োজনীয়তা আলোচনাই এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

৩. গবেষণা প্রশ্ন

- হিজড়া ও প্রতিবন্ধী মানুষেরা কেন চাকরি পায় না?
- চাকরি পেলেও ছেড়ে দেয় কেন/কেন টিকে থাকতে পারে না?
- চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ সমাধানে এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা কি হওয়া প্রয়োজন?
- হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তনে কি করণীয়?

দ্রষ্টব্য : শুধুমাত্র শারীরিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে

'শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'

১. এক পা বা উভয় হাত বা পা না থাকা।
২. কোন হাত বা পা পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অবশ অথবা গঠনগত এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ বা দূর্বল যে, দৈনন্দিন সাধারণ কাজ কর্ম করতে গিয়ে স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

'দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'

১. সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা অর্থাৎ উভয় চোখে একেবারে দেখে না, যথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরেও তীক্ষ্ণতা ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর কম।
২. দৃষ্টি ক্ষেত্র ২০ ডিগ্রী বা এর চেয়ে কম।
৩. আংশিক দৃষ্টিহীনতা - যেমন এক চোখে একেবারেই দেখতে পায় না।
৪. ক্ষিণ দৃষ্টি - উভয় চোখে আংশিক বা কম দেখতে পায়। যাথাযথ লেন্স ব্যবহারের পরেও দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা ৬/১৮ বা ২০/৬০ এবং ৬/৬০ বা ২০/২০০ এর মধ্যে।
৫. দৃষ্টি ক্ষেত্র - ২০ ডিগ্রী হতে ৪০ ডিগ্রীর মধ্যে।

'হিজড়া ব্যক্তি'

ক্রোমোজোমের ত্রুটির কারণে যাদের জন্মপরবর্তী লিঙ্গ নির্ধারণে জটিলতা দেখা দেয়, মূলত তারাই তৃতীয় লিঙ্গ বলে বিবেচিত হবে। 'ট্রান্সজেন্ডার' বলতে এমন এক লৈঙ্গিক অবস্থাকে বুঝায় যা জেনিটিক কারণে নারী বা পুরুষ, এ রকম কোনো শ্রেণীতে পড়ে না। শিশু জন্ম নেওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট বয়সে এসে পুরুষ বা নারীতে পরিণত হতে যেসব হরমোন স্বাভাবিক মাত্রায় থাকা প্রয়োজন, সেসব হরমোনের তারতম্যের কারণেই নারী-পুরুষের বাইরে আরেকটি লিঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে বলে প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়। তবে এভাবে বেড়ে ওঠার জন্য হরমোনের তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক কারণও থাকতে পারে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা প্রতিবেদনটি সম্পন্ন করার জন্য জরিপ ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পরিচালিত হয়। পাশাপাশি গবেষণা দল হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ করে। এছাড়া এ প্রতিবেদনে হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সফলতার গল্প তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এপ্রিল থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন স্থানের ১০০ জন হিজড়া ব্যক্তি এবং ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দৈবচয়নের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী বাছাই করা সম্ভব হয়নি। হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন পরিচিত বিভিন্ন সংগঠনের সাহায্যে অংশগ্রহণকারীদের বাছাই করা হয়েছে। কার্যক্রম শুরুর পূর্বে একটি আলোচনার মাধ্যমে জরিপের প্রশ্নপত্র চুড়ান্ত হয় এবং ০৪ জন জরিপকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জরিপ কাজে পাঠানো হয়। গবেষণা দল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (চাকুরি করে/ করে না), হিজড়া ব্যক্তি (চাকুরি করে/ করে না), তাদের সহকর্মী বৃন্দ, প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ এবং হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা চাকরি করতে আগ্রহী- তাদের মধ্যে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় তিনটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয়। প্রতি আলোচনায় ১২ জন অংশগ্রহণকারী (৩ জন হিজড়া ব্যক্তি, ৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ৩ জন গবেষণা দলের সদস্য, ২ জন অফিস প্রতিনিধি) উপস্থিত ছিলেন। এক্ষেত্রেও পরিচিত সংগঠনের সাহায্যে অংশগ্রহণকারী বেছে নেয়া হয়েছে।

এ গবেষণা প্রতিবেদনে দু'জন ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা হয় যারা দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ে কাজ করছেন এবং একটি সংগঠনের প্রকল্প প্রধানের (যিনি হিজড়া ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করেন) মতামত গ্রহণ করা হয়। হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ১০ জন ব্যক্তির কেসস্টাডি গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও দু'জন ব্যক্তির সফলতার গল্প তুলে ধরা হয়েছে।

বিভিন্ন সংগঠনের ওয়েবসাইট পর্যালোচনা এবং হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান বিষয়ে কাজ করছে বা তাদের নিয়োগ দিয়েছে- এরকম কিছু প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং জার্নাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার প্রতিবন্ধকতাঃ

১. এই সার্ভেটি সগ্র দেশব্যাপী করা সম্ভব হয়নি।
২. সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এই সার্ভের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

৫. আইন ও নীতিমালা

একটি দেশের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে জনগণ। আর প্রতিটি মানুষের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিতকরণে আইন ও নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আইনের মাধ্যমে যে নিয়মগুলো তৈরি হয় তা সকলে মানতে বাধ্য থাকে। গবেষণার প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে। হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সম্পর্কে আইনে যা বলা আছে তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো-

৫.১ জাতীয় আইন ও নীতিমালা

৫.১.১ বাংলাদেশের সংবিধান: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো দেশের সংবিধান। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯, ২৭ এবং ২৮ নং ধারা অনুযায়ী এদেশের প্রতিটি মানুষ সমান এবং রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতিই কোন ধরণের বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে সকল মানুষ সমান অধিকারের দাবীদার। এছাড়াও সংবিধান অনুযায়ী এদেশের কোন নাগরিককেই ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে শিক্ষা অর্জন বা সরকারি কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের জন্য অযোগ্য করা যাবে না।

৫.১.২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩: প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা ও তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার এ আইনটি পাশ করেন। এ আইনের অনুচ্ছেদ ১৬ (১) এ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, শিক্ষা ও কর্মের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতার কারণে কর্মে নিযুক্ত না করা বিষয়ে অনুচ্ছেদ ৩৫ (১) এ বলা হয়েছে, যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যোগ্যতা থাকে তাহলে তাকে উপযোগী চাকরি থেকে বঞ্চিত করা বা তার সাথে কোন ধরণের বৈষম্য করা বা তাকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না।

৫.১.৩ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা: হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও তাদেরকে মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসতে কোন ধরণের আইন প্রনয়ন না হলেও একটি নীতিমালা রয়েছে। যেখানে শুধু মাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে উপবৃত্তি এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ শেষে কিছু আর্থিক অনুদান প্রদানের কথা বলা আছে। সেই প্রশিক্ষণ মডিউলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে হেয়ারকাটিং, বিউটিফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি, আনসার, ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ড বয়, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন এবং কম্পিউটার ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ প্রদানের পর তাদেরকে অফেরৎযোগ্য এককালীন ১০০০০ (দশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান, ঋণ সুপারিশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা হবে বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু বাজার দর বিবেচনায় টাকার পরিমাণটি যৎসামান্য হওয়ায় এবং যথাযথ মনিটরিং না থাকায় অধিকাংশ হিজড়া ব্যক্তিই এ টাকা থেকে আয়বৃদ্ধিমূলক কিছু করতে পারেন না।

৫.২ আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালা

৫.২.১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি): বিশ্বে সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গৃহীত হয়েছে। এসডিজিতে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রাই একে অন্যের পরিপূরক। ৫ নং লক্ষ্যমাত্রায় জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন, ১০ নং লক্ষ্যমাত্রায় দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস, ১১ নং লক্ষ্যমাত্রায় নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা, ১৬ নং লক্ষ্যমাত্রায় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ তৈরি, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও

অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। তবে কর্মসংস্থানের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ৮ নং লক্ষ্যমাত্রায় সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি এসডিজিতে অন্তর্ভূক্তিমূলক একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

৫.২.২ সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্র: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পরে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্র তৈরি হয় এবং বিভিন্ন সম্মেলনে তা প্রকাশ করা হয়। এ ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে- প্রতিটি মানুষই মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারী এবং তাদের প্রাপ্য যে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। অনুচ্ছেদ ১, অনুচ্ছেদ ৩, অনুচ্ছেদ ১৭ (২) এবং অনুচ্ছেদ ২৫ এ সুস্পষ্টভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ নিরসন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি সুরক্ষা, সম্পত্তি, খাবার এবং আশ্রয়ের অধিকার নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে।

৫.২.৩ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জতিক চুক্তি: এ আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বলা আছে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি, দেশের প্রতিটি নাগরিকের "ক্ষুধা থেকে মুক্ত হওয়াসহ প্রত্যেকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"।

৫.২.৪ বিবিধ: বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কুসংস্কারের ইতিহাস বেশ পুরনো। খুব সামান্য কিছু পরিবর্তন হলেও অধিকাংশ দেশই এক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় 'কনভেনশন অন দ্যা রাইটস অব পার্সন্‌স উইথ ডিসএবিলিটিস' এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এই কনভেনশনটি অনুসমর্থন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরবর্তীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় আইন পাশ করে। হিজড়া ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো ধীরে ধীরে জাতিসংঘের কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। (https://ilga.org/treaty-bodies-advance-LGBTI-rights).

হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় সবচেয়ে শক্তিশালী আইন ও নীতিমালা দেখা যায় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ যেমন- সুইডেন ও ডেনমার্কে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশগুলোতেও অগ্রগতি খুবই সামান্য এবং ধীরগতিসম্পন্ন। (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067216300049). বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলেও ভারত (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016), পাকিস্তান (Sindh Empowerment of Persons with Disabilities Act, 2018) ও নেপাল (The Act Relating to Rights of Persons with Disabilities, 2074 (2017)) তিনটি দেশেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে আইন রয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে খুব ধীরে হলেও হিজড়া ব্যক্তিদের অধিকারের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। ভারতে সাংবিধানিকভাবে তারা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। নেপালেও হিজড়া ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং তারা নারী-পুরুষের পরিবর্তে 'অন্যান্য' হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, পাসপোর্ট বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে পারে। কিন্তু স্বীকৃতি থাকলেও তাদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের কোন কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। ফলে তাদের অবস্থারও খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি।

২০০৯ সালে পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট হিজড়া ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতকরণে একটি রুল জারি করে। পাকিস্তান সংসদ তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে একটি আইন পাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নিয়োগদাতা বা ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান যদি হিজড়া ব্যক্তিদের সাথে বৈষম্য করে, তবে তা আইনত দন্ডনীয় হবে। পাকিস্তানের মতো রক্ষণশীল দেশের জন্য এরকম একটি আইন পাশ করা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বিষয়। এ আইনের মাধ্যমে হিজড়া ব্যক্তিরা তাদের স্বীকৃতি পায় এবং সকল প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যেমন- জাতীয় পরিচয় পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, শিক্ষাগত সনদ- তাদের নিজস্ব পরিচয় অনুযায়ী পাওয়ার অধিকার পায়।

৬. সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেকগুলো বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে বিদেশে অত্যন্ত পরিচিত এবং তাদের কার্যক্রমের পরিধি বেশ বিস্তৃত। এরকমই কিছু খ্যাতনামা বেসরকারি সংস্থার ওয়েবসাইট গবেষণার স্বার্থে পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

৬.৪ ব্র্যাক

ব্র্যাক বাংলাদেশের একটি বৃহৎ উন্নয়ন সংগঠন। প্রায় দশ হাজার মানুষ এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। ব্র্যাকের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী, পাঁচ বছরের মাঝে ১০% প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন কর্মে নিয়োগ পাবার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। আগামী দিনগুলোতে তারা সমাজের ১০% প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার চেষ্টা করবে এবং কর্মোপযোগী করে তুলবে। এলক্ষ্যে তারা বিভিন্ন কর্মসূচিও হাতে নিয়েছে।

ইতোমধ্যে ব্র্যাক কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যেমন ব্র্যাকের ওয়েবসাইট দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী করে তোলা হয়েছে। ব্র্যাকের নিজস্ব ভবন প্রবেশগম্য করার উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপশি ঢাকা শহরে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তারা কাজ শুরু করেছে। এছাড়া অস্থায়ী ভিত্তিতে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে।

৬.২ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর ওয়েবসাইটে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ধারণা পাওয়া গেছে। তারা স্পষ্টতই উল্লেখ করেছে যে, যদি কোন আবেদনকারী চাকরি বা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলী পূরণ করে তাহলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কোন বৈষম্য করবে না। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর যদি শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলেও তিনি নিয়োগ পাবেন। এসব ক্ষেত্রে নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ অগ্রাধিকার পাবে।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনে বর্তমানে কত সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কাজ করছে ওয়েবসাইটে তা উল্লেখ নেই। বর্তমানে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন শতাধিক সংগঠনের সাথে কাজ করছে এবং সেই সব প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি এবং প্রতিনিধিত্ব যেন নিশ্চিত হয় সেটি তারা বিশেষ ভাবে নজর দেয়।

৬.৩ আশা এবং কেয়ার বাংলাদেশ

আশা এবং কেয়ার বাংলাদেশের ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ নেই। তবে কেয়ারের আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটে নিয়োগ বিষয়ে আলাদাভাবে কিছু বলা না থাকলেও তারা উল্লেখ করেছে যে তারা চাকরির আবেদনকারীদের মধ্যে কখনোই বৈষম্য করে না। কেয়ার বাংলাদেশ সেই নিয়মই মেনে চলে। অন্য দিকে আশা বাংলাদেশের ওয়েবসাইট হতে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তারা তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছে, কিন্তু নিয়োগ নিয়ে কিছুই বলা হয়নি।

৬.৪ ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং সেভ দ্যা চিলড্রেন

ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং সেভ দ্যা চিলড্রেন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে কাজ করলেও উভয় সংস্থার বাংলাদেশ অফিস তাদের আন্তর্জাতিক বা মূল অফিসের নীতিমালা মেনে চলে। তাই তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া মূল কার্যালয় থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিষ্ঠান দু'টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে স্বল্প পরিসরে হলেও কাজ করে। তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আবেদনকারীদের মধ্যে কখনোই বৈষম্য করে না। যদি কোনো আবেদনকারী নিয়োগের শর্তাবলী পূরণ করে তাহলে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি, প্রতিবন্ধীতা নির্বিশেষে তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। তবে উভয় প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করে কোন হিজড়া বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের অফিসে কর্মরত আছে কিনা সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

৬.৫ অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং জার্নাল

জনপ্রিয় কিছু অনলাইন, প্রিন্ট মিডিয়া এবং জার্নাল থেকে হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ বিষয়ক কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বাংলাদেশ সরকার হিজড়া সম্প্রদায়কে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হিজড়া ব্যক্তিদের সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করতে আমন্ত্রণ জানায়। শুরু থেকেই এ প্রকল্প বাস্তবায়নে নানা সমস্যা ছিলো। হিজড়া ব্যক্তিদের অনেকেই হয়রানির শিকার হয়েছেন এবং তাদের লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে অবান্তর প্রশ্ন করা হয়েছে। একজন হিজড়া ব্যক্তি, যিনি নারীর বেশে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তিনি একটি চাকরি পাওয়ার আশায় নিজেকে বদলে ফেলেন। কারণ তাকে বলা হয়েছে তাকে দেখে অন্যরা ভয় পাবে।

২০১৫ সালে ১২ জন হিজড়া ব্যক্তিদের চাকরির জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে (তারা আসলেই হিজড়া কিনা তা বোঝার জন্য) একটি অশোভন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেনী কর্মচারীরা কোনো সময় ব্যক্তিগত কক্ষে আবার সবার সামনেও অনাকাঙ্খিত এ পরীক্ষা করেন। এ অপমানজনক স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর, তাদের ছবি অনলাইন ও প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয় তারা প্রত্যেকেই 'পুরুষ' এবং সরকারি চাকরি পাবার জন্যে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। কয়েকজন হিজড়া ব্যক্তি জানিয়েছেন, ছবিগুলো প্রকাশ করার পর তাদের প্রতি হয়রানির মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। তারা আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন, এমনকি তারা তাদের পূর্ববর্তী কর্মসংস্থানও হারিয়েছেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, নবাংলাদেশে ১৫ লাখ ৯৩ হাজার ৭০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ঘোষণা দেন, কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তার মোট কর্মীর ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হলে তাদের প্রদেয় করের পাঁচ শতাংশ মওকুফ হবে। অন্যদিকে কোন প্রতিষ্ঠান যদি সরকার প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাসমূহ থেকে প্রতিবন্ধী মানুষদের বঞ্চিত করে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় করের অতিরিক্ত ৫ শতাংশ কর দিতে হবে। ২০২০-২১ অর্থবছর হতে নতুন আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর হবে।

৬.৬ সংক্ষিপ্ত বিবরণী

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এ দেশের প্রতিটি মানুষই সমান সুযোগ ও অধিকারের দাবিদার হলেও বাস্তবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র আমরা দেখতে পাই। বিশেষত হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছেন। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠান এ মানুষগুলোর জীবনমান উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। কতিপয় স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের (ব্র্যাক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, আশা, কেয়ার বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং সেভ দ্যা চিলড্রেন) ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই- তারা বৈষম্যহীনভাবে অর্থাৎ ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি, প্রতিবন্ধীতা নির্বিশেষে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া থাকলেও তাদের কর্মীদের মধ্যে কতজন হিজড়া বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে তা উল্লেখ নেই। অনেকেই সমাজে

সমতা বা বৈষম্যহীন নিয়োগ প্রক্রিয়ার কথা বললেও কার্য ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই যদি নিয়োগ দেয়া হতো, তাহলে এত বিপুল সংখ্যক হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বেকার থাকতো না। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই যদি এ মানুষগুলোর নিয়োগের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন সম্ভব। উল্লেখ্য যে, যে সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কর্মরত রয়েছে।

সরকারের তরফ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের লক্ষে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। কিন্তু একটি সুন্দর উদ্যোগও যথাযথ মনিটরিং এর অভাবে ব্যর্থ হতে পারে। কাজেই নতুন আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের বিষয়টি সরকারিভাবেই মনিটরিং প্রয়োজন। শুধু নতুন প্রতিষ্ঠানই নয়, পুরাতন প্রতিষ্ঠানসমূহেও এ উদ্যোগ কার্যকর করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

হিজড়া ব্যক্তিদের চাকরির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টি সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা প্রয়োজন। সঠিক ও শোভন পদ্ধতিতে হিজড়া ব্যক্তি শনাক্ত করে তাদের চাকরির বিষয়টি সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। এ মানুষগুলোর জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরির সময়ই তাদের লিঙ্গ পরিচয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হলে এ সমস্যার সমাধান সহজ হবে।

৭. ফলাফল

গবেষণা কার্যক্রমটির আওতায় হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জরিপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়। এছাড়াও স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান বিষয়ে কাজ করে-এমন কিছু প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৭.১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জরিপের ফলাফল

এই জরিপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সরকার থেকে তারা কি ধরণের সুবিধা আশা করেন, কি ধরণের চাকরিতে তারা আগ্রহী, কি ধরণের কর্মপরিবেশ চান ইত্যাদি বিষয়ে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। জরিপ দল নিজস্ব পরিচিত সংগঠনের সহযোগিতায় বাছাইকৃত ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিম্নে জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হলো-

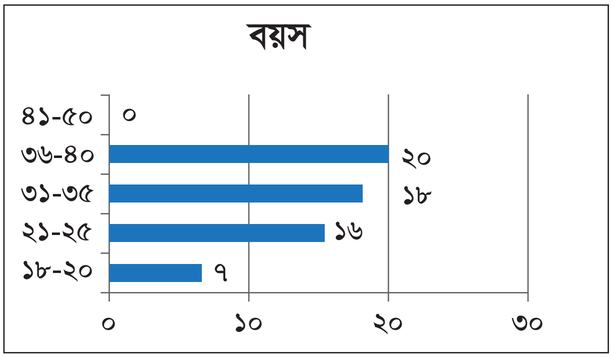

লেখচিত্র ০১: বয়সের ভিত্তিতে জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য

১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে ১৮-২০ বছরের মধ্যে ছিলেন ১১%, ২১-২৫ বছরের মধ্যে ছিলেন ২৬%, ৩১-৩৫ বছরের মধ্যে ছিলেন ৩০% এবং ৩৬-৪০ বছরের মধ্যে ছিলেন ৩৩%। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৬ জন ছিলেন পুরুষ এবং ৪৪ জন নারী। আমাদের এ জরিপে ৬১% শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও ৩৯% দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

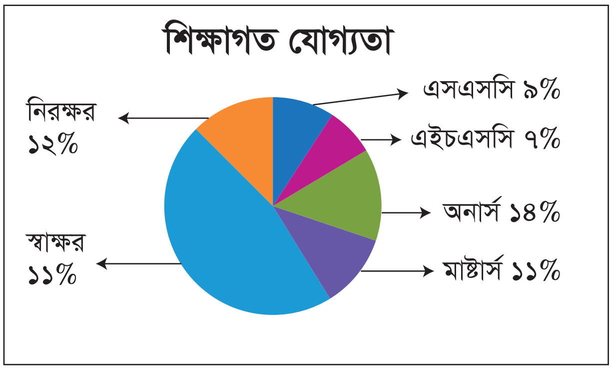

লেখচিত্র ০২: জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

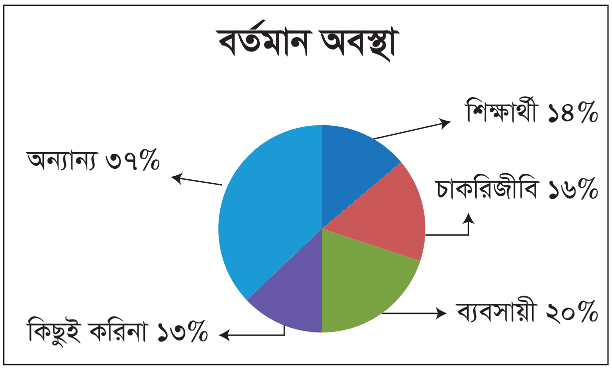

লেখচিত্র ০৩: জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থা

নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা অর্জন অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। আমাদের জরিপের ফলাফলেও বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা জানতে পারি, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই শুধুমাত্র নিজের নাম লিখতে পারেন (৪৭%)। স্নাতক ও স্নাতোকত্তর সম্পূর্ণ করেছেন যথাক্রমে ১৪% এবং ১১%। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৩% জানান তারা কোন কাজের সঙ্গে জড়িত নন। ২০% ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১৬% চাকরিজীবি এবং ১৪% শিক্ষার্থী। ৩৭% অংশগ্রহণকারী জানান যে, তারা ভিক্ষাবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত। তবে তাদের মধ্যে অনেকেই জানান যে, উপযুক্ত কর্মসংস্থান পেলে তারা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেবেন।

অংশগ্রহণকারীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, অধিকাংশেরই পরিবারে ৪-৫ জন সদস্য রয়েছে এবং প্রায় ৪০% জানান যে, তাদের পরিবারের মূল উপার্জনকারী ব্যক্তি তারা নিজেরাই। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হলে তাদের জন্য জীবন ধারণ কতটা কঠিন হয়ে পড়ে।

চিত্র ০১: ডিজেবল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাথে সাক্ষাৎ

কেস স্টাডি: ০১

মো: নাসির উদ্দিন প্রামাণিক একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। বয়স ২৮ বছর। ছোট বেলা থেকে তিনি তার পরিবারের সাথেই থাকেন। এইচএসসি পাশ করার পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি ঢাকায় একটি তৃণমূল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হন। সেখানে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের দক্ষতা অর্জন করেন।

বর্তমানে তিনি স্নাতক পাশ করেছেন কিন্তু কোন চাকরি পাচ্ছেন না। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, আমি শিক্ষিত, অভিজ্ঞতা আছে এবং আমি বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ করে তুলেছি। তা স্বত্বেও আমি চাকরি পাচ্ছি না। বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ইন্টারভিউ ভালো হওয়ার পরেও আমার চাকরি হয়নি এবং কোন কারণও আমাকে জানানো হয় নি। তাই আমি মনে করি আমার শারীরিক প্রতিবন্ধকতাই আমার চাকরির ক্ষেত্রে বাধা।

অনেকেই বলে "চাকরি হচ্ছে সোনার হরিণ"। অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই চাকরি পাচ্ছে না সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুযোগ আরো কম। কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা থাকলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও চাকরি পাওয়ার সমান অধিকার রয়েছে। তাদের চাকরি না পাওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে দায়ী। ইতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন একজন মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে পারে তেমনই নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দেয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য তাদের প্রতি পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরির সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু কাজের পরিবেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব না হওয়ায় তারা চাকরি থেকে ঝরে পড়েছে। এ কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে আগ্রহী হয় না। মো: নাসির উদ্দিন প্রামাণিক বলেন, আমারও বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আর কর্মসংস্থান ছাড়া সম্মানজনকভাবে অর্থ উপার্জন অসম্ভব। আমিও আমার মা-বাবা, পরিবারের দায়িত্ব নিতে চাই। এসব আমি তখনই সঠিকভাবে করতে পারবো যখন আমি চাকরির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হবো।

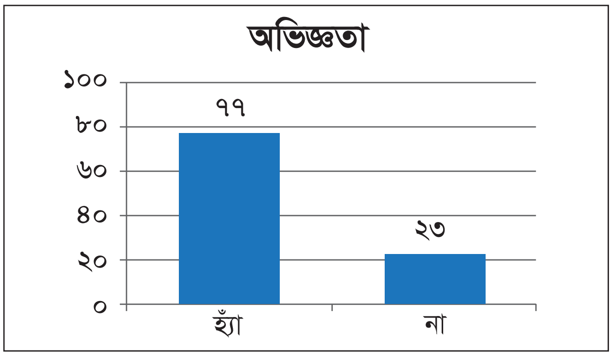

লেখচিত্র ০৪: জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৭৯% শতাংশ জানান তাদের বিভিন্ন ধরণের কর্মদক্ষতা রয়েছে। ৭৭% জানান তাদের কর্ম অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, কম্পিউটার অপারেটর, চাকরি, সাংবাদিকতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রান্না, হস্তশিল্প, যন্ত্রপাতি সার্ভিসিং, শিক্ষকতা, দর্জির কাজ, গৃহকর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৃৎশিল্প, নার্সিং, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাসের কন্ডাক্টর, টেলিফোন অপারেটর, ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে তাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

কেস স্টাডি: ০২

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ না পাওয়া আবার পেলেও সেখান থেকে ঝরে যাওয়ার বিষয়ে প্রিয়াঙ্কা রায় (ছদ্মনাম) জানান, তিনি তিন বছর থেকে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত আছেন। একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জেনেই তাকে প্রতিষ্ঠানটি নিয়োগ দেয়। পূর্বে তিনি অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। বেতনের বিষয়টি বিবেচনা করে তিনি চাকরি পরিবর্তন করেন। প্রথমে ফুল টাইম কাজ করলেও পরে তাকে পার্ট টাইম করা হয় এবং বেতনও অর্ধেক করে দেয়া হয়। এ টাকা দিতেও কর্তৃপক্ষ অনেক সমস্যা করে। ফলে তাকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আবেদন করেও আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় তাকে শত সমস্যা মেনে নিয়েও চাকরি করতে হচ্ছে। কারণ চাকরি হারালে তাকে বিপদে পড়তে হবে। তার মতে, তিনি একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলেই কর্তৃপক্ষ তার সাথে এমন আচরণ করছে। তিনি আরো বলেন, হাতের কাজ, কম্পিউটার এবং টেলিফোন অপারেটরের কাজের উপর আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি। চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো যদি আমার কর্মদক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা বিবেচনা করতো তাহলে আমার কাজ করতে অনেক সুবিধা হতো।

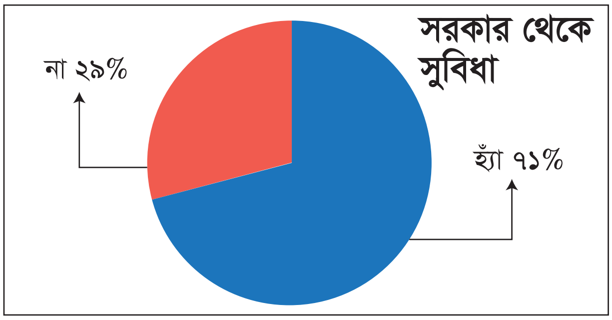

লেখচিত্র ০৫: জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারি সুবিধা প্রাপ্তির তথ্য

৭১% জানান সরকার থেকে তারা সুবিধা পান এবং ২৯% জানান তারা কোন ধরনের সুবিধাই পান না। সুবিধা প্রাপ্তদের শতভাগই জানান যে সরকারের তরফ থেকে তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন সহায়ক উপকরণ বা প্রশিক্ষণ তারা পান না।

চিত্র ০২: ব্যক্তি সাক্ষাৎকার পর্ব

কেস স্টাডি: ০৩

মাকছুদা আক্তার কল্পনা জন্মগতভাবে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী নারী। দারিদ্রতার কারণে ৯ম শ্রেণীর পর তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেন নি। ঠিক তখনই তিনি একটি এনজিও'র সাথে পরিচিত হন এবং আরো কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি বলেন, আমি প্রথমে অনেক আশাবাদী ছিলাম যে, এনজিও ও সংগঠনের মাধ্যমে আমি আবার পড়ালেখার সুযোগ পাবো। কিন্তু অভাবের কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। ২০০৩ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এনজিও এবং সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে আমি বিভিন্ন কাজ করেছি। লেখাপড়া শিখতে না পারলেও জীবন সংগ্রাম আমাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। ফলে আমি হার না মেনে জীবনে স্বাবলম্বী হয়েছি। পরিবার ও সমাজে আমার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে ভর্তি নিতে অনাগ্রহ দেখে ২০০৭ সালে একটি প্রি-প্রাইমারী স্কুল তৈরি করি। আমি পড়ালেখা করতে পারিনি। কিন্তু অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুরাও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হোক- তা আমি চাইনি। ঐ স্কুলে আমি ২০১২ পর্যন্ত শিক্ষকতাও করেছি। বিয়ের পর আমি সংগঠনের সাথে আর তেমন যোগাযোগ রাখতে পারিনি।

দিন মজুর স্বামীর স্বল্প আয়ে অত্যন্ত কষ্টে সংসার চলছিলো। তখনই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নারীদের বিনামূল্যে সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যাপারে জানতে পারি। আমিও সেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং ভালো কাজের পুরস্কারস্বরূপ একটি সেলাই মেশিন পাই। আমাকে যাতায়াত খরচটিও প্রদান করা হতো। সেলাই মেশিনটি দ্বারা আমি খুবই উপকৃত হই। প্রথম দিকে অল্প কিছু কাজ পেলেও বর্তমানে আমি পরিচিতি পেয়েছি। এখন আমি আমার স্বামীর সাথে গ্রামে থাকি, নতুন ঘর তৈরি করেছি, সন্তানকে পড়ালেখা করাচ্ছি। স্বামীর পাশাপাশি সংসারে আর্থিক অবদান রাখছি। আমার সংসার এখন ভালই চলছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিনটি আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এনেছে। সকল প্রতিবন্ধী নারীদের এ ধরণের সুযোগ প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা একটু সহযোগিতা পেলেই জীবনে অগ্রসর হতে পারবে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে এগিয়ে আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কারো উপর বোঝা হবে না, ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য হবে না, বরং স্বাবলম্বী হয়ে জীবনযুদ্ধে জয় লাভ করবে।

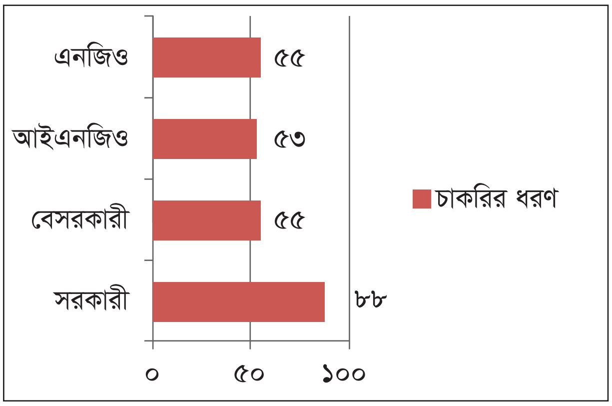

লেখচিত্র ০৬: জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি ধরণের চাকরিতে আগ্রহী সে বিষয়ক তথ্য

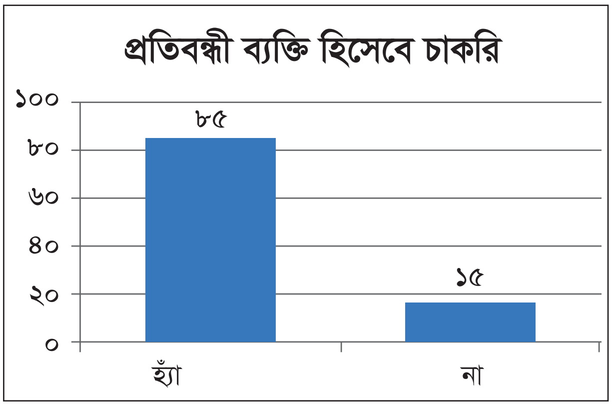

লেখচিত্র ০৭: জরিপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবেই চাকরিতে আগ্রহী

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৯০% জানান যে তারা চাকরি করতে আগ্রহী। তাদের অধিকাংশই (৩৫%) জানান তারা সরকারি চাকরিতে অধিক আগ্রহী। তবে বেসরকারি (২২%), এনজিও (২২%) এবং আইএনজিওতেও (২১%) তাদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮৫ জনই জানান যে তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবেই চাকরি পেতে চান। তারা বলেন, প্রথম থেকেই নিয়োগদাতা এবং সহকর্মীদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয়তা এবং অবকাঠামো সম্পর্কে জানা থাকলে তাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকা সহজ হবে। বাকি ১৫% অংশগ্রহণকারী জানান, তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলে মানুষের করুণা পেতে চান না, বরং মানুষ হিসেবে কর্মসংস্থানের অধিকারের নিশ্চয়তা চান।

কেস স্টাডি: ০৪

জন্মগতভাবেই মোঃ নুরুল আলম একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। ছোট বেলাতে অনেক ডাক্তারের কাছে গিয়েও তাকে নিরাশ হতে হয়। যখন জানতে পারলেন যে তাঁর পা দুটির কোন চিকিৎসা সম্ভব নয়, তখন দুঃখ পেলেও তিনি হতাশ হননি। জীবনের লড়াই এ হেরে যাবেন না- এ বিষয়ে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলেন- সংসারের অভাবের কারণে আমি পড়ালেখা করতে পারি নি। কিন্তু উপার্জনের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি আমি বেছে নিতে চাই নি। কষ্ট হলেও কোন একটা কাজের মাধ্যমে উপার্জনের পথ আমি খুঁজতে থাকি। হঠাৎ-ই সে সুযোগটি পেয়ে যাই। বাসের কন্ডাক্টর হিসেবে আমি চাকরি পাই। বর্তমানে আমি ঢাকায় থাকি এবং লোকাল বাসের কন্ডাক্টর হিসেবে নিয়োজিত আছি। কোন কারণে যদি গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকে তাহলে অস্থায়ী বিভিন্ন কাজ, যেমন- বেলুন বিক্রি করি। তিনি আরো বলেন, আমি উপার্জন করে বাড়িতে সাহায্য করতে পারি-এটা ভেবে আমার ভালো লাগে। নিজের প্রয়োজনীয় টাকা রেখে বাকি টাকা বাড়িতে দেই।

মোঃ নুরুল আলম বলেন, স্বাধীনভাবে কাজ করলেও আমাকে বিভিন্ন বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অন্যান্য হেলপারদের মানুষ যত সহজে গ্রহণ করে, আমাকে অনেক সময় সেভাবে গ্রহণ করে না। মুখে কিছু না বললেও আড়চোখে তাকান। যাতায়াতের পথে অনেক তীর্যক দৃষ্টি আমাকে উপেক্ষা করতে হয়। গাড়ির স্টাফরা আমার সাথে খারাপ আচরণ করে না কিন্তু ছাত্র ও অন্যান্য যাত্রীরা মাঝে মাঝে খারাপ আচরনণ করে। সরকার যদি একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে আমাকে সহযোগিতা করতো তা হলে অনেক ভালো হতো।

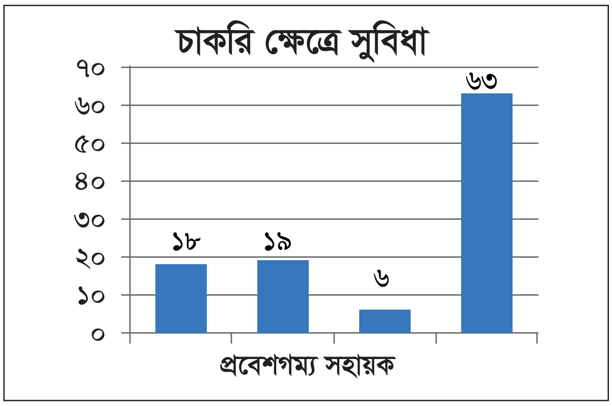

লেখচিত্র ০৮: জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরিক্ষেত্রে সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য

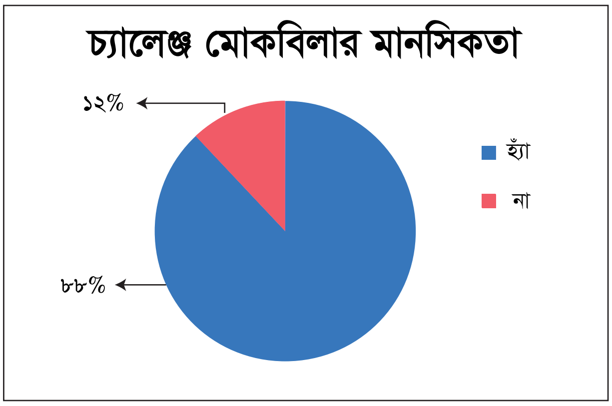

লেখচিত্র ০৯: জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরিক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মানসিকতা

চাকরির ক্ষেত্রে কি ধরণের সুবিধা চান জানতে চাইলে ৫৯% অংশগ্রহণকারী জানান তারা প্রবেশগম্যতা, সহায়ক পরিবেশ এবং বেতন অর্থাৎ সবগুলো সুবিধাই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। তবে ১৮% সহায়ক পরিবেশ, ১৭% প্রবেশগম্যতা এবং ৬% বেতনের কথা উল্লেখ করেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮৮% জানান যে, চাকরি ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হতে হবে তা মোকাবেলা করার মানসিকতা তাদের রয়েছে।

চিত্র ০৩: ব্যক্তি সাক্ষাৎকার পর্ব

কেস স্টাডি: ০৫

মোহাররম আলী জানান, আমি মাত্র ১৮ মাস বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবন্ধীতার শিকার হই। প্রথম দিকে এক পায়ে লাফিয়ে চলাফেরা করতে পারলেও বয়স ও শরীর বাড়ার সাথে সাথে হুইলচেয়ার ব্যবহার করা আমার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। বর্তমানে আমি একটি ম্যানুয়াল চেয়ারে চলাফেরা করি। জুলাই ২০০২ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সাভারে অবস্থিত পক্ষাঘাত গ্রস্তদের পুর্নবাসন কেন্দ্র- সিআরপিতে স্বল্প বেতনে চাকরি করি। তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে জেলাভিত্তিক একটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংস্থা গড়ে তুলি।

ডিপিও এর নিবন্ধন হওয়ার পরে ২ টি ভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে আমি উচ্চশিক্ষা অর্জনের প্রয়োজন অনুভব করি। ২০১৬ সালে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ৪ বছরের (অনার্স) কোর্সে ভর্তি হই। তারপর এই বিষয়ে মার্ষ্টাস করার ইচ্ছা আছে। স্নাতক শেষ করার সাথে সাথেই একটি চাকরিতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি মনস্থির করে মে ২০১৯ থেকেই আমার যোগ্যতা, বয়স এবং প্রতিবন্ধীতার ধরণ বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে আমি খুব আশাব্যঞ্জক কোন সাড়া পাইনি।

আমার জীবনে বেশির ভাগ অর্জন হয় সিআরপিতে চাকরি করা কালীন। এ সময় ২০১১ সালের জুন মাসের ২৫ তারিখে হুইলচেয়ারে করে বিশ্ব ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। আমি মোট ১৬টি দেশ ভ্রমণ করেছি। ভিসা পাওয়া ব্যতীত যে সমস্যাটির মুখোমুখি আমি হয়েছি তা হলো প্রবেশগম্যতার অভাব। ওয়ারশ (Warsaw), বার্লিন (Berlin), লিখটেনস্টেইন সিটি (Liechtenstein), সুইজারল্যান্ডের ভাদুরা (Vadura), রোম (Rome), মিলান (Milan), ব্রাসেল্স (Brussles), লন্ডন (London), নিউ ইয়র্ক (New York) এবং ওয়াশিংটন ডিসি'র (Washington DC) অধিকাংশই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব হলেও অন্যান্য জায়গাগুলোতে প্রবেশগম্যতার অভাবে আমাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এমনকি লন্ডনের মতো একটি দেশেও আমি অনেক জায়গায় বাধার সম্মুখীন হয়েছি। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সামাজিকভাবে সবদিক থেকে পিছিয়ে আছে। তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ পাশ হওয়ার পরে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে আমার বিশ্বাস।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাদের কর্মদক্ষতা বা ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা আমাদের জানান, নিজের চেষ্টায়ই তারা জীবনের পথে এগিয়ে চলেছেন। এজন্য তাদের দৃঢ় মনোবল, ধৈর্য্য এবং সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়েছে। শিক্ষা অর্জন তাদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। আবার কেউ কেউ জানান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন সংস্থা তাদের এক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। তারা আরো বলেন, পরিবারের সহযোগিতা পেলে তাদের চলার পথ অনেক সহজ হতো। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭১%ই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ সম্পর্কে অবগত নন। ২৯% শংশ অংশগ্রহণকারী আইন সম্পর্কে অবগত হলেও এ আইনে কি বলা আছে বা তাদের কোন অধিকারগুলো নিশ্চিত করা হয়েছে, তা জানেন না।

কেস স্টাডি: ০৬

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত নিগার আহমেদ বলেন, ছোট বেলায় প্রতিষেধক টিকা না দেওয়ার ফলে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে আমি প্রতিবন্ধীতার শিকার হই। বর্তমানে আমি একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী। ছোট বেলা থেকে জীবনে চলার পথে নানা বাধা বিপত্তির মুখে পরতে হয় আমাকে। অনেকেই আমাকে বলতো যে, আমি পরিবারের জন্য একটি অভিশাপ। আমার মা-বাবাকে সবাই নানান ধরণের কটু কথা বলত। পড়ালেখায় আমার আনন্দ ও মনোযোগ দেখে ছোট বেলায় আমার মা তার কষ্ট স্বত্বেও আমাকে কোলে করে স্কুলে নিয়ে যাওয়া শুরু করে।

আমার ছোট ভাইয়ের জন্মের পর তার দেখাশোনা আর আমার লেখাপড়া দুটো একসাথে করা আমার মায়ের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হওয়ায় আমার লেখাপড়া অনেকটাই বন্ধ হয়ে যায়। তবে আমি হাল ছেড়ে দেইনি বরং বাসায় বসে লেখাপড়া চালিয়ে গেছি। মায়ের কোলে করে স্কুলে গিয়েই আমি এইচএসসি পাশ করি। এরপর থেকে আমার মায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি এবং আমার শরীরও ভারী হয়ে যাওয়ায় আমাকে বহন করা মায়ের পক্ষে আরো কষ্টকর হয়ে ওঠে। তারপরেও আমি ডিগ্রীতে ভর্তি হই এবং ২০০১ সালে ডিগ্রী পাশ করি। কিন্তু আর পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আমি পড়ালেখা শেষ করে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং বিভিন্ন স্থানে চাকরির চেষ্টা শুরু করি। পরিবার থেকে চাকরি করার ক্ষেত্রে সম্মতি না পাওয়ায় ৭ বছর ঘরে বন্দি ছিলাম। এরপর আমার মনে হলো এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। আমি আবারও চাকরির চেষ্টা করি এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আমার চাকরিও হয়ে যায়। তারা আমাকে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবেই চাকরিতে নিয়োগ দেন। আমার প্রবেশগম্যতার কথা চিন্তা করে আমার জন্য অফিসে র‍্যাম্প তৈরি করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটি থেকে আমাকে ২ বছর পর পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধির আশ্বাস দেয়া হলেও বাস্তবে কোনটিই ঘটেনি। আমার বেতন বাসা ভাড়া ও জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট ছিলো না। এমনকি আমার যাতায়াত খরচও অন্যান্যদের থেকে বেশি। উপরন্তু সপ্তাহে ৪ দিন আমাকে ঢাকায় এসে ফিজিওথেরাপি নিতে হতো। চাকরিতে যোগদানের ২ মাসের মাধ্যে আমার সুপারভাইজার আমার সাথে বিরূপ আচরণ করতে শুরু করেন। তিনি আমাকে নানা ভাবে অপমান করতেন। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জীবনধারণের জন্য অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। শুধুমাত্র জীবনমান উন্নয়ন নয় বেঁচে থাকার জন্যও তাদের কাছে চাকরি অতি জরুরী।

৭.২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের জরিপ ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়মে চাকরি পাওয়ার জন্য প্রথমেই শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের যোগ্য করে তুলতে হয়। কিন্তু অবকাঠামোগত এবং সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ একটি কষ্টসাধ্য বিষয়। ফলে প্রথমেই চাকরির বাজারে তারা পিছিয়ে যান অনেক খানি। কিন্তু তারপরও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এবং সফলও হচ্ছেন। কিন্তু তারপরও চাকরি পাওয়া তাদের জন্য একটি দুরূহ বিষয়। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলেই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা স্বত্বেও তাদের চাকরি থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই তাদের পরিবারের মূল উপার্জনকারী ব্যক্তি। চাকরি বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা তাদের জীবন ধারণ অসম্ভব করে তোলে। এ ধরণের প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে কেউ কেউ প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন কাজে নিজেদের দক্ষ করে তুলেছেন। আবার কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসা ও চাকরির সাথে সম্পৃক্ত আছেন। তবে অধিকাংশই কোন কাজের সুযোগ না পেয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে সম্পৃক্ত হতে বাধ্য হয়েছেন।

আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি একটি নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন তারা কোন কাজ করতে পারেন না এবং এ সমাজের বোঝা। এ কারণে চাকরি পেলেও সেই চাকরিতে টিকে থাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ দেশের পরিবহণ ব্যবস্থা, সড়ক এবং গণস্থাপনাগুলোর অধিকাংশই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব নয়। ফলে প্রতিদিন কর্মস্থলে যাওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রেই তারা সহকর্মীদের কাছে অবহেলার শিকার হন। এমনকি নিয়োগ দানকারীরাও তাদের সাথে পদোন্নতি এবং বেতন নিয়ে বৈষম্য করেন। ফলে তারা কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারেন না।

তবে সবটাই নেতিবাচক নয়, বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগও রয়েছে। সরকার থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ- যেমন ভাতা প্রদান, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গৃহীত হয়েছে। এমনকি বেসরকারি পর্যায় থেকেও তাদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের জন্য কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংস্থা রয়েছে, যেগুলো তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। ফলে কতিপয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উপকৃতও হয়েছেন। কিন্তু এ পদক্ষেপগুলোর ক্ষেত্রেও কিছু প্রশ্ন রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় দাতা সংস্থার শর্ত অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রকল্প ভিত্তিক বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকল্প বা চুক্তি শেষ হয়ে যাবার পর এ মানুষগুলো ঝরে যান। ফলে তারা পুনরায় একই সমস্যায় পড়েন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্রমাগত জীবন যুদ্ধ করে সামনে এগিয়ে চলার প্রত্যয় দেখে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, চাকরি ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হতে হবে তা মোকাবেলা করার মানসিকতা তাদের রয়েছে। শুধু তাদের একটি বৈষম্যহীন সহায়ক পরিবেশ এবং সুযোগ প্রয়োজন। এই মানুষগুলো নিজেদের কঠোর চেষ্টায় জীবনে এগিয়ে চলেছেন। আমাদের সহযোগিতার হাত তাদের জীবনকে সহজ ও উপভোগ্য করে তুলবে।

চিত্র ০৪: মো নুরুল আলম শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হলেও বাস কন্ডাক্টরের কাজ করছেন

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান

তালুকদার রিফাত পাশা, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

বাংলাদেশে বর্তমানে কতজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আছে এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার হার কতটুকু সে বিষয়ে কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক এবং ধারাবাহিক পদক্ষেপের ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা নানাবিধ কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অত্যন্ত কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে শিক্ষা অর্জন করলেও কাজের বৈচিত্র্যতা না থাকা এবং প্রতিবন্ধীতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ না পাওয়ার কারণে তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হচ্ছে না।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ পাশ করেছে। উক্ত আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে ১২ ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে। ধারণা করা হয়, দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এই মানুষগুলোর শিক্ষা ও শিক্ষা পরবর্তী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে তা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি গ্রাফিক্সের কাজ করতে পারবে না আবার একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি গ্রাফিক্সের কাজ করতে সক্ষম কিন্তু তার প্রবেশগম্যতার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়া আবশ্যক। কাজেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যতা এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

বর্তমানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র মানবিক বিষয়ে লেখাপড়া করছে। মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বাণিজ্য বা বিজ্ঞান শাখায় পড়ালেখা করার কোন সুযোগ তাদের নেই। যদি মানবিক বিভাগের পাশাপাশি তাদের জন্য বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখায় লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তাহলে তাদের কাজের সুযোগ আরো বিস্তৃত হবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারেই ভিন্ন। তাদের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হলো চাকরিস্থলে প্রবেশগম্যতার অভাব। অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে চাকরি হলেও তাদের সেখানে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে যায়। একারণে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানও তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হয়। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেকারত্ব দূর করতে একটি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, গবেষণা হলেও কোন কার্যকর সুফল পাওয়া যায়নি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ ভাগ মানুষ প্রতিবন্ধীতার শিকার। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য আনুষ্ঠানিক কাজ বা চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষত গভীর/চরম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তা প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থান হতে পারে একটি উপযোগী সমাধান। এজন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যেসকল সমস্যা আছে তা চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন প্রশিক্ষণের অভাব, পুঁজির অভাব, উৎপাদিত পণ্যের বিপননের সুবিধা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। তাহলেই সফলতা আনয়ন সহজ হবে।

এতো প্রতিকূলতার মাঝেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দক্ষতার সাথে কাজ করে চলেছে। আমাদের সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের আছে মেধা ও কর্মস্পৃহা। এ মেধা ও কর্মস্পৃহাকে কাজে লাগাতে হবে দেশ ও সমাজ গঠনের কাজে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অনেক সফলতা অর্জন করছে। তাদের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও এগিয়ে যেতে হবে।

তাই আমাদের সঠিক ও সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য আইন ও নীতিমালা রয়েছে। এখন প্রয়োজন বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। এই বিনিয়োগ শুধুমাত্র সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন এই বিনিয়োগের মাধ্যমে উপকৃত হয় এবং তাদের জীবন মান উন্নত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে সমতা আনয়নে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

দেবরা ইফরইমসন, আঞ্চলিক পরিচালক, হেলথব্রিজ-কানাডা, নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবিয়িং (আইডাব্লিউবি) বাংলাদেশ

অনেক বছর ধরে এনজিও সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত হলেও কখনোই সেভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরির বিষয়টি আমি চিন্তা করিনি। কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্যতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মীয় এবং আদিবাসীদের কথাটিই বিবেচনা করা হয়েছে। একদিন একটি অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করি যেখানে অধিকাংশই ছিলো পুরুষ। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিলো। তখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি দলের সাথে আমার পরিচয় হয়। তাদের আন্তরিক ব্যবহারের কারণে আমি খুব সহজেই তাদের সাথে মিশে যাই। এক বছর পর একই আয়োজনে আবার তাদের সাথে আমার দেখা হয়। তখন আমি বুঝতে পারি তারা ধরেই নিয়েছে যে আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করি।

আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান সব সময়ই অন্তর্ভূক্তিমূলক নকশা এবং অবকাঠামো বিষয়ে এডভোকেসি করি। কাজেই বলা যায় খুবই স্বল্প পরিসরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে আমাদের কাজ রয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আমাদের সাথে কর্মরত ছিলেন না। দুই জন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তি আমাকে পরামর্শ দেন যে, 'আপনি ভিন্ন প্রতিবন্ধীতার একজন নারী এবং একজন পুরুষকে আপনার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিন।'

আমাদের প্রতিষ্ঠানটি হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য প্রবেশগম্য ছিলো না। এখনও আমাদের হুইলচেয়ারবান্ধব টয়লেট নেই, লিফটে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সাউন্ড সিস্টেম নেই। কিন্তু বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা খুব সহজেই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। তারা নিজেদের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা নয়, বরং একটু সুযোগ আশা করেন। সমাজের অন্যান্য মানুষদের মতোই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে চান।

আমি আমার অফিসে কয়েকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছি। তাদের নিয়ে আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের পূর্বে অফিসের অন্যান্য কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন প্রয়োজন, যা আমাদের অফিসের ক্ষেত্রে হয়নি। ফলে কিছু কর্মীর তাদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। সাময়িক সমস্যা হলেও এক্ষেত্রে আমাদের অর্জনই বেশি। যারা আমাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেয়েছেন তারা চাকরি করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত খুশি এবং নিজেদের দক্ষ করে তোলার জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে মেশার সুযোগটি শুধু আমাদের কর্মকর্তাদের উপকৃত করছে তা নয়, বরং আমাদের অফিসে বেড়াতে আসা অতিথি বা কাজের প্রয়োজনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাদের সাথে দেখা করছেন প্রত্যেকেই উপকৃত হচ্ছেন। কারণ এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা এবং সমাজের মূলস্রোতে তাদের অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলেই জানতে পারছেন। আমরা অনেক আগে থেকেই অন্তর্ভূক্তিমূলক অবকাঠামো এবং নকশার জন্য সরকারের সাথে এডভোকেসি করে আসছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে আমাদের এ কার্যক্রম আরো ফলপ্রসূ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে একটা কথা না বললেই নয়, অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গঠনের পথে পদক্ষেপ নিতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত।

চিত্র ০৫: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহন পর্ব

৭.৩ হিজড়া ব্যক্তিদের জরিপের ফলাফল

এই জরিপের মাধ্যমে হিজড়া ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সরকার থেকে তারা কি ধরণের সুবিধা আশা করেন, কি ধরণের চাকুরিতে তারা আগ্রহী, কি ধরণের কর্মপরিবেশ চান ইত্যাদি বিষয়ে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। জরিপ দল নিজস্ব পরিচিত সংগঠনের সহযোগিতায় বাছাইকৃত ১০০ জন হিজড়া ব্যক্তির মধ্যে এ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিম্নে জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হলো।

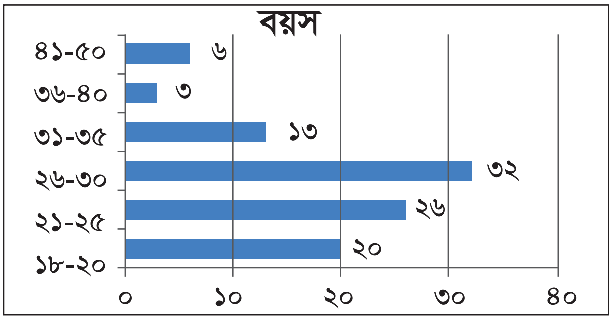

লেখচিত্র ১০: বয়সের ভিত্তিতে জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিদের তথ্য

জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৩২% ছিলেন ২৬-৩০ বছরের মধ্যে। এছাড়া ২১-২৫ বছরের মধ্যে ২৬%, ১৮-২০ বছরের মধ্যে ২০%, ৩১-৩৫ বছরের মধ্যে ১৩%, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬% এবং ৩৬-৪০ বয়সসীমার মধ্যে ছিলেন ৩%।

চিত্র ০৬: হিজড়া ব্যক্তিদের জরিপ কার্যক্রম

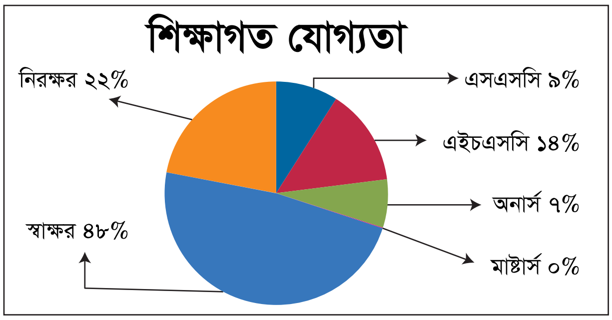

লেখচিত্র ১১: জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

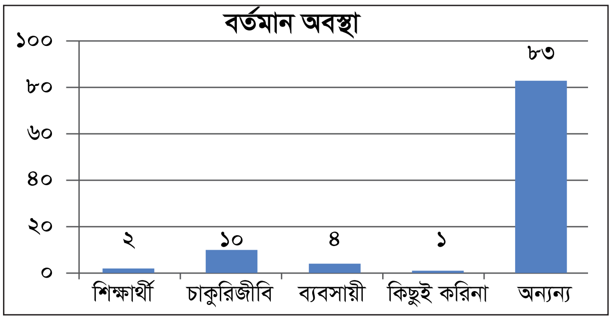

লেখচিত্র ১২: জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থা

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশ (৪৮%) হিজড়া ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের নাম লিখতে পারেন। বাকিদের মধ্যে ২২% নিরক্ষর, ১৪% এইচএসসি পাশ, ৯% এসএসসি পাশ এবং শুধুমাত্র ৭% স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তবে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউই স্নাতোকত্তর পর্যন্ত লেখাপড়া চালিয়ে যাননি। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১০% জানান তারা চাকরিজীবি, ৪% ব্যবসায়ী এবং ২% শিক্ষার্থী। ১% অংশগ্রহণকারী জানান তারা কিছুই করেন না। ৮৩% ভিক্ষাবৃত্তির (বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি 'তোলা' হিসেবে পরিচিত- প্রকৃতপক্ষে এটিও এক ধরণের ভিক্ষাবৃত্তি) কার্যমের সাথে সম্পৃক্ত।

জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে জানা যায়, তাদের মধ্যে শতভাগই পরিবার থেকে বঞ্চিত। কাজেই তার পরিবার বলতে তিনি একাই এবং মূল উপার্জনকারী ব্যক্তিও তিনি। অল্প কিছু সংখ্যক হিজড়া ব্যক্তি জানান, তারা পরিবারের সাথে না থাকলেও প্রতি মাসে পরিবারে তারা টাকা দেন।

কেস স্টাডি: ০৭

ফরিদুল ইসলাম জোনাক এর বয়স আনুমানিক ৩৬ বছর। বাবা-মা এবং ছয় ভাইবোন মিলে একই পরিবারে বসবাস করতেন। ছোট বেলায় তিনি একজন ছেলের অবয়বে জন্ম গ্রহণ করলেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে সমাজের মানুষ ও পরিবার তার আচরণে কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করেন। তিনি নিজেও কিছু ভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারছিলেন। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি একজন হিজড়া ব্যক্তি তখন পরিবার থেকে চলে আসতে বাধ্য হন।

জোনাক বাড়ি থেকে চলে আসার কারণ হিসেবে একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমার বড় বোনের বিয়ে বার বার ভেঙ্গে যাচ্ছিলো। আমি আপুকে জিজ্ঞাসা করলাম এমন কেন হচ্ছে? তখন সে কান্নায় ভেঙ্গে পরে আমাকে জানায় আমি হিজড়া বলে কেউই আমাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে চায় না।

ছোট বেলায় আমার পড়ালেখায় কোন সমস্যা না থাকলেও আমি যখন ৮ম শ্রেণীতে পড়ি তখন থেকেই হিজড়া হওয়ার কারণে আমি বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে শুরু করি। স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি এমনকি পরিবার থেকেও বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমি স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করি। এরপর আর ধৈর্য্য হয়নি সকল কথাকে উপেক্ষা করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেয়ার। আমি এখানেই আমার পড়ালেখার ইতি টানি।

বর্তমানে আমি একজন হিজড়া ব্যক্তি হিসেবেই বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে চাকরি করছি। কর্মস্থলের সুন্দর পরিবেশ এবং সহকর্মীদের বন্ধু সুলভ আচরণ ও সহযোগিতাই আমাকে চাকরি করার মনোবল যুগিয়েছে। কিন্তু অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই ধরণের সুবিধা নেই বলেই হিজড়া ব্যক্তিরা চাকরি করার সুযোগ পাচ্ছে না।

চিত্র ০৭: হিজড়া ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ

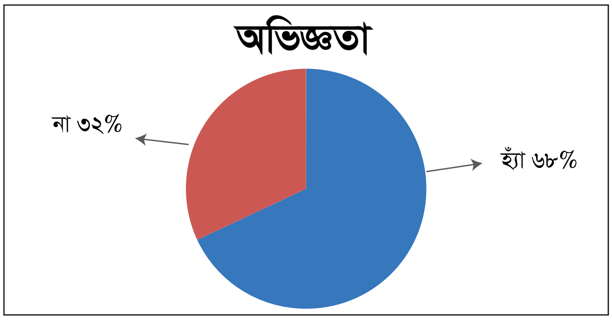

লেখচিত্র ১৩: জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজরা ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৮% হিজড়া ব্যক্তি জানান তাদের কর্মদক্ষতা আছে এবং কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যাদের কাজের দক্ষতা রয়েছে তাদের মূলত দর্জির কাজ, বিউটিফিকেশন, রান্না এবং হস্তশিল্পের দক্ষতা রয়েছে।

জরিপে অংশগ্রহণকারী শতভাগ হিজড়া ব্যক্তিই জানান যে তারা ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান পেতে আগ্রহী। অনেক ক্ষেত্রেই হিজড়া ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। কিন্তু টাকার পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ায় এবং যথাযথ মনিটরিং না থাকায় এ কাজটি ফলপ্রসূ হয় না। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৯৯% চাকরি করার ক্ষেত্রেও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। শুধুমাত্র একজন চাকরি করতে চান না বলে জানান। হিজড়া ব্যক্তিদের জন্য উপার্জন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তারা ক্ষুদ্র ঋণ বা চাকরি যে কোনভাবেই হোক না কেন একটি সম্মানজনক উপার্জন এর উপায় পেতে আগ্রহী।

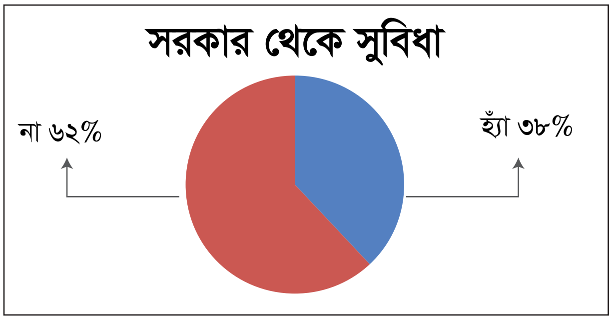

লেখচিত্র ১৪: জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিদের সরকারি সুবিধা প্রাপ্তির তথ্য

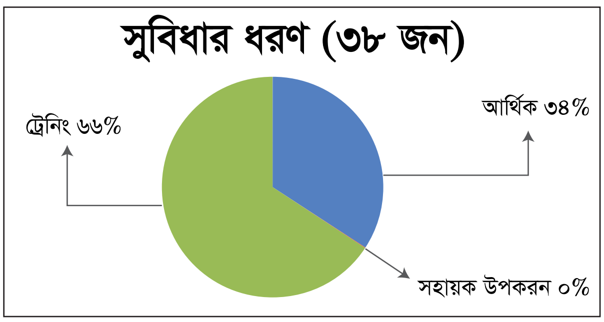

লেখচিত্র ১৫: জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিদের সরকার থেকে প্রাপ্ত সুবিধার ধরণ

৩৮% হিজড়া ব্যক্তি জানান যে, সরকার থেকে তারা সুবিধা পান। তবে ৬২% হিজড়া ব্যক্তিই কোন ধরণের সুবিধা পান না বলে জানান। যে সকল হিজড়া ব্যক্তি সরকার থেকে সুবিধা পান তাদের মধ্যে ৬৬% প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। ৩৪% আর্থিক সহায়তা লাভ করেন। তবে তারা কোন ধরণের সহায়ক উপকরণ সরকার থেকে তারা পান না। যারা সরকার থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন, তারা প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগানোর চেষ্টা করলেও সফলতা পান নি।

কেস স্টাডি: ০৮

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর লেগস প্রকল্পে জুনিয়র এডভোকেসি অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন শোভা সরকার। শোভা সরকার একজন হিজড়া ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমার জীবনে আমি অনেক প্রতিবন্ধকতা পেড়িয়ে আজকের অবস্থানে এসেছি। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো সহজ শিক্ষাজীবন আমার ছিলো না। অনেক কষ্টে আমি এসএসসি পাশ করি। জীবিকার প্রয়োজনে আমি যখন চাকরি খুঁজতে শুরু করি, তখনও আমাকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সেসময় আমি ব্লাস্টের উঠান বৈঠকের বিষয়ে জানতে পারি। তাদের প্রতিটি বৈঠকে আমি অংশগ্রহণ করতাম। এক সময় তাদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতে শুরু করি। পরবর্তীতে আমার কাজে খুশি হয়ে তারা হিজড়া ব্যক্তিদের একটা প্রকল্পে আমাকে চাকরি দেন।

তিনি আরো জানান, একজন হিজড়া ব্যক্তি হিসেবেই আমি নিয়োগ পেয়েছি। অন্যান্য হিজড়া ব্যক্তিদের কাউন্সিলিং দেয়া ও তাদের জন্য এডভোকেসি করার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। হিজড়া ব্যক্তিদের বর্তমান জীবনধারার কারণে তাদের পক্ষ হয়ে এডভোকেসি করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। হিজড়া ব্যক্তিদের প্রতি মানুষের নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তন করা একটি সময়সাপেক্ষ বিষয়। অপরদিকে হিজড়া ব্যক্তিরাও আমাকে সহজে বিশ্বাস করতে পারেন না। তারা মনে করেন, তাদের জীবনমানের কোনভাবেই উন্নয়ন হবে না। প্রথমদিকে আমাকে আরো বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হতো। ধীরে ধীরে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে আমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমাদের দেশের বেশির ভাগ হিজড়া ব্যক্তিদের জীবনের বাস্তবতা অত্যন্ত কঠিন। তারা যে পরিবেশে বেড়ে উঠে সে কারণে তারা আত্মবিশ্বাসী নয়। সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তারা বহুলাংশে পিছিয়ে আছে।

চিত্র ০৮: সফল হিজড়া ব্যক্তি-ইভান আহমেদ কথা এবং অনন্যা বণিক

কেস স্টাডি: ০৯

ইভান আহমেদ কথা একজন হিজড়া ব্যক্তি, বয়স আনুমানিক ৫৭ বছর। তার বেড়ে ওঠা এবং লেখাপড়া ঢাকা শহরে। তিনি একজন ছেলে হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যান্য শিশুদের মতোই তার শৈশব কাটে কিন্তু কৈশোরে তার সমস্যাগুলো ধরা পরতে থাকে। তিনি বলেন, আমি যখন স্কুলে যেতাম ছেলে হয়েও মেয়েলি আচরণের জন্য সহপাঠিরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো, শিক্ষকরা আমাকে অমানবিক শাস্তি দিতো। আমি বেশির ভাগ সময় ক্লাস করতে পারিনি কারণ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে ঢুকেই আমাকে বিভিন্ন ধরণের শাস্তি দিয়ে বাহিরে পাঠিয়ে দিতেন। সকল ধরণের শাস্তি সহ্য করেও আমি এইচএসসি পাশ করতে সক্ষম হয়েছি।

ইভান আহমেদ কথা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি সফলতার সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এর মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি, হিজড়াদের যৌন নির্যাতন বন্ধ, এইচআইভি এইডস সম্পর্কে হিজড়াদের সচেতনতা তৈরি, তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (নারীপক্ষ, সমাজসেবা অধিদপ্তর) পরিচিত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র হিজড়া নয়, যৌনকর্মীদের নিয়েও তিনি বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি নাচ ফাউন্ডেশনের নৃত্য পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ইভান আহমেদ কথা বলেন, শুধুমাত্র হিজড়া বলে আমাকে অত্যন্ত কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। আমাদের দেশে অধিকাংশ হিজড়া ব্যক্তিরাই অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করেন। তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ না করা হলে তারা ক্রমান্বয়ে আরো পিছিয়ে পড়বে। এ কারণে কথা কলি শিশু কিশোর সংগঠন, কথা কফি কর্নার, এস.কে মিডিয়া সেন্টার, কথা বুটিক, বনফুল বিউটি পার্লার, শিখন্ডি কথার স্ক্রিপ্ট লেখা এ সকল কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে যাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, এ সকল কার্যক্রম করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এর মধ্যে অন্যতম হলো আইইডিসিইআর (IEDCER) এবং এসডাব্লিউএনওবি (SWNOB)। বর্তমানে একজন হিজড়া ব্যক্তি হিসেবে তিন বছর যাবৎ আইসিডিডিআরবি-তে সহকারি রিসার্চ অফিসার হিসেবে কর্মরত আছি।

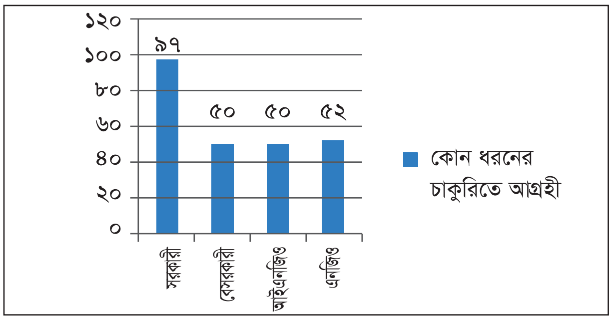

লেখচিত্র ১৬: জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিরা কি ধরণের চাকরিতে আগ্রহী সে বিষয়ক তথ্য

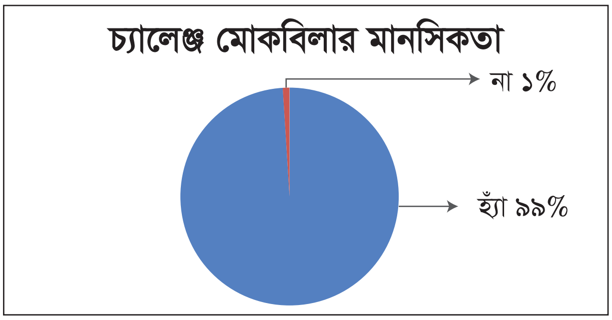

লেখচিত্র ১৭: জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিদের চাকরিক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মানসিকতা

জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিরা বলেন, যে কোন চাকরি পেলেই তারা করবেন। বেসরকারী (৫০ জন), আইএনজিও (৫০ জন), এনজিও (৫২ জন) পছন্দের তালিকায় রাখলেও সরকারি চাকুরিতেই অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের (৯৭ জন) আগ্রহ বেশি। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৯৯% হিজড়া ব্যক্তি জানান চাকরির ক্ষেত্রে সকল ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মানসিকতা তাদের আছে।

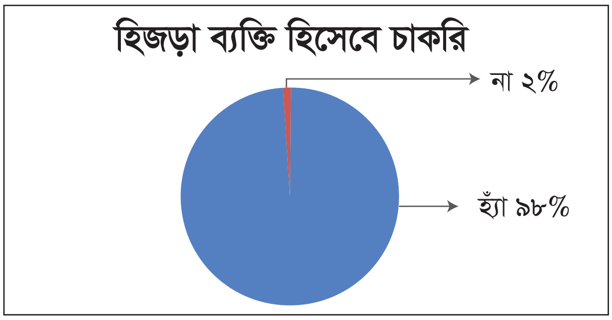

লেখচিত্র ১৮: জরিপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই হিজড়া ব্যক্তি হিসেবে চাকরিতে আগ্রহী

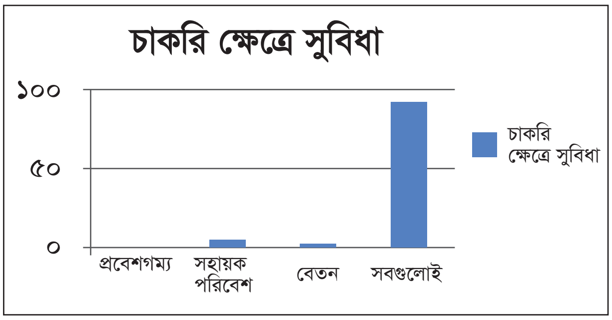

লেখচিত্র ১৯: জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিদের চাকরিক্ষেত্রে সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য

৯৮% জরিপে অংশগ্রহণকারী বলেন তারা হিজড়া ব্যক্তি হিসেবেই চাকরি পেতে আগ্রহী। কারণ অনেক সময় দেখা যায় চাকরিতে নিয়োগের পর হিজড়া ব্যক্তি জেনে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়। ফলে তারা প্রথম থেকেই তাদের পরিচয় সম্পর্কে সকলকে অবগত করতে চান। কিন্তু ২% জানান তারা মানুষ হিসেবে সমাজের অন্য সব মানুষের মত সমান অধিকার চান। হিজড়া ব্যক্তি বলে পৃথক হতে চান না। সেই সাথে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৪% হিজড়া ব্যক্তিই জানান যে, চাকরি ক্ষেত্রে তারা প্রবেশগম্যতা, সহায়ক পরিবেশ, বেতন সবগুলো সুবিধাই আশা করেন। তবে ৫% সহায়ক পরিবেশ এবং ১% বেতনের কথা উল্লেখ করেন।

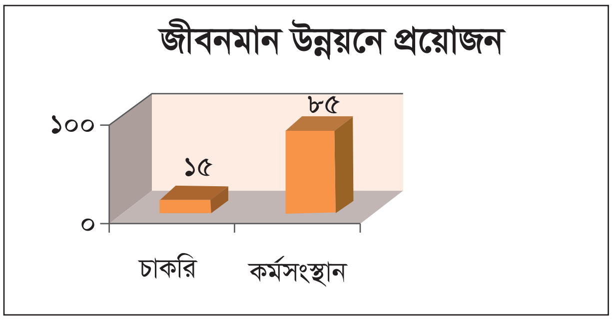

লেখচিত্র ২০: জরিপে অংশগ্রহণকারী হিজড়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই চাকরিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন

জরিপে অংশগ্রহণকারী ১০০ জন হিজড়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৮৫ জনই জানান যে, জীবনমান উন্নয়নে তারা কর্মসংস্থানকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। চাকরি ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তারা চাকরিতে আগ্রহী হন না। সহকর্মীদের বিরূপ আচরণ, খন্ডকালীন বা প্রকল্পভিত্তিক চাকরির কারণে তারা এ বিষয়ে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের 'পরিবার ও সমাজের নেতিবাচক আচরণ থেকে আপনি কিভাবে বের হয়ে এলেন'- এ প্রশ্নটি করা হলে প্রত্যেকেই বলেন যে, তারা পরিবার থেকে বিতাড়িত। খুব ছোটবেলায় বাড়ি থেকে বেড়িয়ে তারা সকলেই অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করেছেন। পরিবারগুলো হিজড়া সন্তান হলে তাদের প্রতি সহযোগিতামূলক আচরণ করবে এ বিষয়ে তারা প্রত্যেকেই সন্দিহান।

কেস স্টাডি: ১০

আরশী জাহানের বয়স ১৭ বছর। তিনি বরিশালে থাকতেন। যখন তিনি ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন তখন থেকেই বুঝতে পারেন তিনি অন্যান্য নারী বা পুরুষের থেকে একটু ভিন্ন। তার আচার আচরণে বিভ্রান্ত হয়ে পরিবার থেকে তার লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়। অনেক প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তিনি বরিশালেই ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন।

আরশী বলেন, আমি স্কুলে ছেলে পরিচয়েই ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু যত দিন যায় আমি বুঝতে পারি, আমার মধ্যে মেয়েলী আচরণ বেশী। আমি মেয়েদের মত পোশাক পড়তে এবং সাজগোজ করতে পছন্দ করি। আমার এ আচরণ পরিবার থেকে যখন মেনে নিতে পারছিলো না তখন পায়ে শিকল দিয়ে আমাকে ঘরে বন্দী করে রাখে। সেসব দূর্বিষহ দিনের কথা মনে হলে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি।

যখন তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল তখন তিনি পার্লারে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর কিছু মানুষের সহযোগিতায় বাড়ি থেকে পালিয়ে আরশী ঢাকায় চলে আসেন। বর্তমানে শুধু হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষগুলোই তার পরিবার। তিনি বলেন, আমি আমার পরিবারে থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারলাম না। তারা কেউ আমার সাথে যোগাযোগ রাখতে চান না। আমি আবার লেখাপড়া করতে চাই। বইবন্ধু আলোঘর থেকে লেখাপড়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আমি এমন অনিশ্চিত জীবন চাই না। আমি একজন হিজড়া তার জন্য আমি দায়ী নই।

৭.৪ হিজড়া ব্যক্তিদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের জরিপ ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

হিজড়া জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকেই এ জনগোষ্ঠীটি অবহেলিত এবং অনগ্রসর। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ মানুষগুলো সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। ফলে অধিকাংশ হিজড়া ব্যক্তিই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। যারা লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত হন, কারা প্রায় সবাই অসহনীয় ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শিকার হয়ে মাঝপথেই লেখাপড়া ছেড়ে দেন। ফলে এদেশের স্বাভাবিক নিয়মে প্রথমেই কারা চাকরির জন্য যোগ্য হয়ে ওঠেন না। আর কেউ যদি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য আবেদন করেন, শুধুমাত্র হিজড়া ব্যক্তি বলে তাদের চাকরি দেয়া হয় না। ফলে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক তাগিদে তারা ভিক্ষাবৃত্তি, চাঁদাবাজি ও বিভিন্ন অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়েন।

হিজড়া ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক টানাপোড়েন প্রবল। কারণ পরিবার থেকে তারা বিতাড়িত, সমাজে তারা অনাদৃত-অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু আমরা ভূলে যাই তারাও মানুষ। এ অমানবিক আচরণ তাদের প্রাপ্য নয়। এ সব নেতিবাচক আচরণকে পেছনে ফেলে খুব অল্প সংখ্যক হলেও কিছু হিজড়া ব্যক্তি নিজেদের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কেউ চাকরি করছেন আবার কেউবা চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের ব্যবসা। পাশাপাশি অন্যান্য হিজড়া ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য তারা কাজ করছেন।

সমাজের মূল স্রোতধারায় এ মানুষগুলোকে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। সরকার থেকে হিজড়া ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ পরবর্তী তাদের ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। কিন্তু টাকার পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ায় এবং যথাযথ মনিটরিং না থাকায় এ কাজটি ফলপ্রসূ হয় না। কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিজড়া ব্যক্তিদের চাকরিতে নিয়োগ দিচ্ছেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও যাতে এ বিষয়ে এগিয়ে আসে সে বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

কতিপয় প্রতিষ্ঠান হিজড়া ব্যক্তিদের প্রকল্পভিত্তিক বা খন্ডকালীন চাকরি দিচ্ছেন। কিন্তু এটি সঠিক বা স্থায়ী সমাধান নয়। এ দেশের নাগরিক হিসেবে অন্যান্য সকল মানুষের মতোই চাকরি বা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সম্মানজনক উপার্জনের সমান অধিকার তাদের রয়েছে। শুধুমাত্র নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে কর্মক্ষম মানুষগুলো জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারছেন না, সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত হয়ে একটি অবর্ণনীয় কষ্টের জীবন যাপন করছেন। হিজড়া ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এবং সমান সুযোগ ও সহযোগিতামূলক আচরণ তাদের এ জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন আনতে পারে।

চিত্র ০৯: বৈচিত্যতাই আমাদের শক্তি

বৈচিত্র্যতাই আমাদের শক্তি

তালুকদার রিফাত পাশা, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করার পর আমি যখন চাকরি খুঁজছিলাম ঠিক তখনই ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্টে চাকরি করার একটি সুযোগ এলো। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করবো? কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সাধারণত সরকারি চাকরি অথবা বেসরকারি সংস্থার মাঝে ডিপিওতে (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান) চাকরি করে। এই পরিস্থিতিতে একটি মূলধারার এনজিওতে কাজ করার বিষয়ে আমি একটু দ্বিধাগ্রস্থ ছিলাম। কিন্তু চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে নিয়োগ পাওয়া ও কিছু দিন কাজ করার পর আমি উপলব্ধি করলাম "বৈচিত্র্যতাই আমাদের শক্তি"।

আমাদের কর্মস্থলে সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষ কাজ করেন। এখানে নারী, পুরুষ, ভিন্ন ধর্মের মানুষ, প্রতিবন্ধী-অপ্রতিবন্ধী এমনকি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সাথে কাজ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাদের সাথে কাজ করার মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারছি। আমার সহকর্মীদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা সেভাবে ছিলো না। আমাদের সাথে কাজ করার মাধ্যমে তারাও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন ও তাদের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারছেন।

আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ নিয়ে একটি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এই আগ্রহ কখনো কখনো কুসংস্কার বা ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। মানুষের এ ভুল ধারণাগুলো দূরীকরণে কর্মক্ষেত্রে বৈচিত্র্যতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টে চাকরি করতে গিয়ে আমি দেখেছি একে অপরের সাথে কাজ করার মাধ্যমে মানুষের মাঝে থাকা ভুল ধারণাগুলো ভেঙ্গে দেয়া যায়।

একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গঠনের প্রধান দিক হলো সকলের চিন্তাকে শ্রদ্ধা জানানো। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টে কাজ করে এবং বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে আয়োজন করার মাধ্যমে তাদের চিন্তা শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং মানুষের মাঝে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য আমরা কাজ করছি। সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতের জন্য কাজ করার পাশাপাশি আমরা অন্যান্য বিষয়েও কাজ করছি। একটা সময় মনে করা হতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শুধু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়েই কাজ করবে। এ ধারণা থেকে বেড়িয়ে এসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এখন জলবায়ু পরিবর্তন, অসংক্রামক ব্যাধি, যান্ত্রিক যান পরিহার করে অযান্ত্রিক যানকে প্রাধান্য দেয়া ইত্যাদি বিষয়েও কাজ করছে। এতে করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। এ মানুষগুলোকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি প্রদানের মাধ্যমে তাদের সমাজের একটি সম্পদে পরিণত করা সম্ভব।

চিত্র ১০: বৈচিত্যতাই আমাদের শক্তি

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনই আনতে পারে সমাজের উন্নয়ন

নাঈমা আকতার, সহকারি এডভোকেসি কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

অনেক দিন ধরেই আমি চোখের কিছু সমস্যায় ভুগছিলাম। বার বার বিভিন্ন ডাক্তার দেখানোর পরেও কোন সুফল পাচ্ছিলাম না। হঠাৎই একজন ডাক্তার বললেন, আপনি ব্রেনের একটা এমআরআই করে আসেন। আমার একটু ভয় হলো। এমআরআই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর আমার মনে হলো পায়ের নিচে মাটি সরে গেছে। ডাক্তারি ভাষা সেভাবে না বুঝলেও এটুকু বুঝলাম আমার ব্রেনে টিউমার আছে। এবার আর চোখের ডাক্তার নয়, গেলাম নিউরোলজিস্ট এর কাছে এবং জানলাম টিউমারটা যথেষ্ট বড়। কাজেই অপারেশন ছাড়া আর কোন কিছুই করার নেই। প্রথম যে কথাটা আমার মনে হলো- এটাই তাহলে জীবনের শেষ।

কিন্তু সেটা আসলে শেষ নয়, মাত্র শুরু ছিলো। অপারেশনের জন্য নিউরোসার্জন এর কাছে গিয়ে জানলাম, টিউমারটা বিনাইন বা সহজ ভাষায় বললে ক্যান্সার নয়। কিন্তু আমার ব্রেনের যেখানে টিউমারটা আছে সেই জায়গাটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। কাজেই অপারেশনের কিছু ঝুঁকি আছে। তার মধ্যে একটি হলো প্যারালিসিস। সেটা পুরো শরীরও হতে পারে আবার আংশিকও হতে পারে। কিন্তু বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করার চেয়ে ঝুঁকি নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই অপারেশন হলো এবং ভালোই হলো। শুধু অপারেশনের একটা চিহ্ন থেকে গেলো। আর তা হলো আমার মুখের ডান পাশটা প্যারালিসিস এ আক্রান্ত হলো।

আমার যতটা না শারীরিক সমস্যা হলো, তার থেকে অনেক বেশি হলো মানসিক সমস্যা। কারণ আমাকে দেখলেই বোঝা যায় মুখের ডান পাশটা অন্যরকম। এ কারণে মানুষের নানাবিধ প্রশ্ন, বাঁকা চোখে তাকানো- এসবর মুখোমুখি হতে হয়েছে। অনেকেই হঠাৎই প্রশ্ন করে আপনার কি হয়েছিলো? কেউ হয়তোবা কিছুই জিজ্ঞেস করতো না- কিন্তু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এমনকি আমার আত্মীয় স্বজনও এ ধরণের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আমাকে ফেলেছেন। সবটা দেখে খুব খারাপ লাগতো। আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছিলো। এ সময়ে আমার পাশে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছিলেন আমার মা এবং স্বামী। তারা আমাকে বুঝিয়েছেন আমি কঠিন একটি অসুখকে হারিয়ে কেন এত ছোট একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবো। একই সঙ্গে আমার সহকর্মীরাও আমাকে মনের জোর যুগিয়েছেন। তারা কখনো আমাকে বুঝতে দেননি আমি এখন একটু অন্যরকম।

আমার মুখের প্যারালিসিস এর কারণে আমার কোন কাজ বাধাগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু তারপরও আমাকে মানুষের বাঁকাদৃষ্টি এবং অযাচিত অস্বস্তিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ থেকেই আমি ধারণা করে নিতে পারি আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কতটা কঠিন জীবন যাপন করতে হয়। হিজড়া ব্যক্তি হলে তো কথাই নেই। কিন্তু ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেই এ মানুষগুলোর চলার পথ অনেক সহজ হয়ে উঠবে। একই সাথে পরিবারের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সদস্যরা যদি সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করেন এবং মনোবল যুগিয়ে যান তাহলে এ মানুষগুলো আত্মবিশ্বাসী হয়ে সব বাধা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন।

চিত্র ১১: জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের একটি সচেতনতামূলক কার্যক্রম

৭.৫ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

গবেষণার আওতায় আমরা তিনটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করি। প্রতিটি আলোচনায় ১২ জন অংশগ্রহণকারী (৩ জন হিজড়া ব্যক্তি, ৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ৩ জন গবেষণা দলের সদস্য, ২ জন অফিস প্রতিনিধি) উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দুটি আলোচনায় আমরা হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যাগুলো বিস্তারিতভাবে বোঝার চেষ্টা করি। তৃতীয় আলোচনায় তাদের কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধানে কি করণীয় সে বিষয়টি উঠে আসে। নিম্নে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য আলোচনা করা হলো-

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা-১

অনেকের ধারণা যে আমরা (হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) কাজ করতে পারি না বা পারবো না। সকলে মনে করে, হিজড়া ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে বিতারিত করাই একমাত্র সমাধান। মানুষটি কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে বা কি খাবে এই সম্পর্কে কেউ ভেবে দেখে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে কেউ মনে করেন ভিক্ষুক আর কেউবা তাদের লুকিয়ে রাখতে চান চার দেয়ালের মধ্যে। পরিবার ও সমাজে আমাদের এর চেয়ে বেশি কোন মর্যাদা নেই। কাজে নিয়োগ দেয়া তো দূরে থাক, কেউ আমাদের সাথে ঠিকভাবে কথাই বলতে চায় না।

চিত্র ১২: গবেষণাকালীন ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা-২

আমাদের (হিজড়া ব্যক্তি) আচরণ বিরূপ হওয়ার প্রধান কারণ আমাদের জীবনযুদ্ধ। আমরা যখন মানুষের কাছে কাজ চাই কেউ কাজ দেয় না, ভিক্ষা চাইলে তাও দেয় না। কিন্তু টাকা ছাড়া আমরা বাঁচবো কি করে? বাধ্য হয়ে জোর করে টাকা আনতে হয়। তখন সবাই বলে হিজড়ারা ছিনতাই করে। কিন্তু কেন করে তা কেউই ভেবে দেখে না। তৃণমূল পরিবারের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অর্থ উপার্জনের জন্য ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে এ অবস্থান থেকে অনেকেই আর বেড়িয়ে আসতে পারেন না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি হলেও ঐ মানুষগুলোর জন্য কর্ম পরিবেশ মোটেই সহায়ক নয়। রয়েছে সামাজিক ও অবকাঠামোগত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও বৈষম্য। ফলে কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাদের জন্য।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা- ৩

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদের জনবল অনুযায়ী কিছু সংখ্যক হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা প্রয়োজন। যেহেতু এ মানুষগুলো শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায় না কাজেই তাদের জন্য চাকরির শর্তাবলী কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে। পাশাপাশি সহকর্মীদের সাথে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা, সকল ধরণের বৈষম্য নিরসন করা প্রয়োজন। এজন্য শুধুমাত্র হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরই নয়, প্রতিষ্ঠানের সকলকেই কাউন্সেলিংয়ের আওতায় নিয়ে আশা দরকার। তাহলেই এই জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব এবং তারা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৭.৬ ফোকাস গ্রুপ আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী

হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়োগ দেন। কিন্তু তারা নামমাত্র সুযোগ পান আর অসুবিধা ভোগ করেন অগুনতি। অনেক ক্ষেত্রেই নিয়োগের পর তাদের সাথে আর কোন আলোচনা করা হয় না বা মতামত নেওয়া হয় না। নিয়োগ কালে যে সকল প্রতিশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেয়া হয়, সেখানেও গাফিলতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও এ কর্মীদের বিভিন্ন ধরণের মানসিক চাপে (নাম মাত্র বেতন, অতিরিক্ত কাজ, নিজের দায়িত্ব ছাড়াও অন্য কাজ প্রদান, পদোন্নতি না দেয়া ইত্যাদি) রাখা হয়।

হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি পাওয়া যেহেতু কঠিন হয় এ কারণে প্রতিষ্ঠান তাদের চাপ প্রয়োগ করেন। এ মানুষগুলোর চাকরি টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তাকে পুঁজি করে তাদের জিম্মি করা হয়। এ ধরণের প্রতিকূলতা সহ্য করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা চাকরি করতে পারে না বা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। আর হিজড়া ব্যক্তিদের তো কোথাও (বাড়ি/ অফিস) প্রবেশ করতেই দেওয়া হয় না। যে মানুষটি অল্প হলেও শিক্ষিত তাকে পেটের তাগিদে বাধ্য হয়েই ভিক্ষাবৃত্তি বা অনৈতিক উপায়ে টাকা আনতে হয়।

নিয়োগের কথা বললেও খুব সামান্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠানই হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়েছেন। আবার নিয়োগ দিলেও তাদের জন্য উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়নি এবং তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টাও করা হয়নি। বিলাশবহুল জীবন নয়, এ মানুষগুলো সম্মানজনক উপার্জনের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জীবনযুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন।

৮. হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ

বাংলাদেশের খ্যাতনামা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেগুলো হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান নিয়ে কাজ করে- তার মধ্যে থেকে কিছু প্রতিষ্ঠান এ গবেষণার আওতায় পরিদর্শন করা হয়। অফিস পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো এ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম, বিশেষত হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান নিয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা। যে ০৭ টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৮.১ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়রানির শিকার হন। আর বিচারপ্রার্থী যদি নারী, শিশু বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর হন, তাহলে ভোগান্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এটি একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত এবং দুস্থ ও প্রান্তিক মানুষেরা সহজেই এখান থেকে আইনী সহায়তা পেয়ে থাকে। ব্লাস্ট মূলত প্রান্তিক ব্যক্তিদের সকল প্রকার আইনি সহায়তা করে থাকে যেমন : জমি সংক্রান্ত মামলার সমাধান, চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, বিভিন্ন প্রকার সভা সেমিনারের মাধ্যমে কাউন্সিলিং ও অ্যাডভোকেসি করা যাতে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে। সংস্থাটির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়াও ছয়টি বিভাগীয় শহর এবং তেরটি জেলা শহরে ব্লাস্টের শাখা কার্যালয় রয়েছে। ব্লাস্টের কিছু প্রকল্পের আওতায় হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মরত আছেন।

৮.২ অদম্য ফাউন্ডেশন

প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য চাকরি বা কর্ম সংস্থানের বিকল্প নেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যদি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হয় তাহলে তারা পরিবার এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে না। এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে ২০১৩ সাল থেকে পিছিয়ে পড়া এ মানুষগুলোর জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছে অদম্য ফাউন্ডেশন।

এ সংস্থাটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাওয়ারও ব্যবস্থা করে। এর পরেও তারা নিয়মিত তদারকি করে থাকে। কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি চাকরি ছেড়ে দেয়, তাহলে এর কারণ অনুসন্ধান করে তারা এর সমাধান করার জন্যও সচেষ্ট থাকেন।

অদম্য ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা জনাব তারিকুল হক বলেন, আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা এখনও সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করতে পারছি না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতার ধরণ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা শুধুমাত্র শারীরিক এবং বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। তবে ধীরে ধীরে আমাদের কাজের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করবো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করা স্বত্ত্বেও আমরা তাদের অনেকের কাছ থেকেই সহযোগিতা পাই না। যেমন প্রশিক্ষণের পর চাকরির ইন্টারভিউ দিতে না যাওয়া, চাকরিতে যোগ না দেয়া, চাকরি শুরুর কিছুদিন পর চাকরি ছেড়ে দেয়া এবং অদম্য ফাউন্ডেশন বা কর্মস্থলের সাথে যোগাযোগ না করা ইত্যাদি। ২০১৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তারা দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৫০ জনের অধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে কর্মে নিযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

৮.৩ সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইস্ড (সিআরপি)

১৯৭৯ সালের ১১ ডিসেম্বর ড. ভ্যালেরি এ্যান টেইলর পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র 'সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইস্ড (সিআরপি)' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হলো সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, পুনর্বাসন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অবকাঠামো এবং তথ্যের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা। তারা মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে তাদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং সহায়তা প্রদান করে থাকে। স্বাস্থ্য এবং পুনর্বাসন বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি সিআরপি অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের সেবাকেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এছাড়াও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদের বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি রয়েছে।

চিত্র ১৩: প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন (সিআরপি)

সিআরপি এলাকাভিত্তিক সেবা এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষত নারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য হাতে কলমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা করে আত্মকর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরির বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং অফিসার মোঃ সালাউদ্দিন বলেন, যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সিআরপি নিয়মিতই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরি দিয়ে থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে এ বিষয়ে এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং করে থাকে। এর ফলে অনেক গার্মেন্টস, প্রাইভেট ব্যাংক, কর্পোরেট অফিসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরিও হয়েছে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা এখন পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে তেমন কোন কাজ করতে পারিনি।

নিজে একজন অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি হওয়া স্বত্ত্বেও মোঃ সালাউদ্দিন দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা দিয়ে আসছেন। এ বিষয়ে তার অনভূতি প্রকাশ করে তিনি বলেন, শিক্ষা জীবন শেষ হবার সাথে সাথেই আমি সিআরপিতে কর্মজীবন শুরু করি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের সমাজের বোঝা নয় তারা আমাদের সমাজেরই অংশ। প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সহযোগিতা পেলেই তারা তাদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার প্রমাণ দিতে পারে। আমার পাশের সহকর্মী একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। কিন্তু আমি কখনো তার কাজের মাঝে প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি উপলব্ধি করিনি। তিনি তার নিজ যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা দিয়ে সাচ্ছন্দ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন।

কর্মক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয়তা

দেবরা ইফরইমসন, পরামর্শক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
এবং নির্বাহী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীং (আইডাব্লিউবি) বাংলাদেশ

আমাদের মত অনেকেই আছেন যারা এনজিও প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এ খাতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। এ খাতের মাধ্যমেই আমরা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছি। কিন্তু অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মক্ষেত্র তেরির ব্যাপারে অনেকেই ভেবে দেখেন না। কাজের সূত্রেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া ব্যক্তি এবং সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের সাথে আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। তাদের সাথে মিশে আমার মনে হয়েছে এ সকল মানুষের কর্মসংস্থান অত্যন্ত জরুরি। তাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। এতে করে তারা যেমন উপকৃত হবে, একই সাথে সমাজের অন্যান্য সকলে তাদের সাথে মেশার সুযোগ পাবে। এর ফলে হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে মানুষের মনে যে সকল ভূল এবং নেতিবাচক ধারণা রয়েছে তা ধীরে ধীরে দূরীভূত হবে এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার পথটিও সহজ হয়ে উঠবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে নারী, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং কিছু আদিবাসী মানুষ কর্মরত ছিলেন। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (অথবা হিজড়া ব্যক্তি) নিয়োগের বিষয়টি আমি প্রথম দিকে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখিনি। একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে কয়েকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয় হয় এবং তাদের আন্তরিক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। তখনই প্রথম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরিতে নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা করি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঐ দলটি আমাকে পরামর্শ দেয় যে, কয়েকজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে আমি তাই করি।

এক্ষেত্রে খুব সামান্য আচরণগত পরিবর্তন আমরা করেছি। যেমন- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাথে দেখা করার সময় রুমে প্রবেশ বা বের হওয়ার সময় তাদের সেটা জানানো। যেহেতু বিষয়টি আমাদের প্রতিষ্ঠানে নতুন কাজেই শুরুর দিকে কিছু সমস্যা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে প্রাপ্তিই বেশি। একদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে এবং সমাজের মূলস্রোতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে দেশ জাতির কল্যাণে অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছে। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে মেশার সুযোগ পেয়ে অফিসের সকলের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। এজন্য সামান্য কিছু সমস্যা খুব সহজেই মেনে নেয়া যায়।

প্রতি বছরই আমাদের প্রতিষ্ঠানে চট্টগ্রামের এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন (এইউডাব্লিউ) থেকে বিভিন্ন দেশের (বিশেষত বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল এবং ভিয়েতনাম) বেশ কিছু ইন্টার্ন আসে। তাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা আমাদের অফিসেই প্রথম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া অফিসের বিভিন্ন আয়োজনে হিজড়া ব্যক্তিদের সাথেও তারা কাজ করেছে। তাদের কাছ থেকে আমি খুব ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে আমাদের সহজ-সাধারণ ব্যবহার তাদের চমৎকৃত করেছে। কয়েকজন আমাকে এমনও বলেছে যে, তারা ভবিষ্যতে যে প্রতিষ্ঠানে যাবে সেখানে জানতে চাইবে সেখানে কেন হিজড়া বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয় না। আমার বিশ্বাস সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে তারা ভবিষ্যতে অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। ইন্টার্নদের কিছু প্রতিক্রিয়া আমাকে মুগ্ধ করেছে-

'এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি আমাদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-প্রতিবন্ধিতা নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে এবং সম্মান দিতে শিখিয়েছে। এখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং হিজড়া ব্যক্তিদের সাথে মেশার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত।'- হিমা আবদুল্লাহ

'এই ইন্টার্নশীপ থেকে আমি শিখেছি পৃথিবীর সব মানুষ সমান। যত পার্থক্য বা প্রতিবন্ধকতাই থাকুক না কেন, তাদের পরিচয় তারা মানুষ এবং প্রত্যেকের অধিকারও সমান। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি হয়। এ কারণে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরী। পৃথিবীর সকল মানুষের সমান অংশগ্রহণেই একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। আইডব্লিউবি এর অফিসে সকলকে সমান হিসেবে বিবেচনা করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিভার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তারা কাজ করছে। এ বিষয়টি আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে।- শুক্তি দাস'

৮.৪ এইড ফাউন্ডেশন

১৯৯২ সাল থেকে ঝিনাইদহে এইড ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। মানব কল্যাণে প্রত্যয়ী বেসরকারি ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এইড ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন কর্মসূচি) মোঃ দোয়াবখ্‌শ শেখ বলেন, দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। বর্তমানে তারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অবহেলিত। ফলে মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়ে একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শিকার হয় তারা। প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা না থাকায় তারা চাকরি বা কর্মসংস্থানের মাধ্যমে উপার্জন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে পরিবার ও সমাজে অবহেলা ও অমর্যাদায় অতিবাহিত হয় তাদের কর্মহীন জীবন। একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য উপার্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রচলিত সামাজিক নেতিবাচক মনোভাবের কারণে তাদের মেধা ও সৃজনশীলতাকে অবহেলা করে বোঝা বলে অভিহিত করা হয়। ফলে চাকরি করার জন্য যে শিক্ষা বা দক্ষতা প্রয়োজন, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও কাজ করতে সক্ষম এ বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা না থাকায় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিয়োগে নিরুৎসাহিত হয়। এ কারণে তাদের উপযোগী কর্ম পরিবেশ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই নিশ্চিত হয় না। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও পরিবার, সমাজ ও দেশ গঠনে সমান অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে এইড ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরি/কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করে আসছে। এইড ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি নিজস্ব বিদ্যালয় পরিচালনা করে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষ করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান, সহায়ক উপকরণ বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম তাদের রয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানটিতে কতিপয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মরত রয়েছেন।

৮.৫ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন একটি বেসরকারি ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাস করে প্রতিটি মানুষের অধিকার সমান এবং এ বিশ্বাস থেকে সমাজের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে তারা কাজ করে। তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের একটি হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়ন । এজন্য সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে তারা এ্যাডভোকেসি করে চলেছে।

চিত্র ১৪: প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন (মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠান)

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর প্রোগ্রাম অফিসার নাজরানা ইয়াসমিন হীরা বলেন, বর্তমানে বড় সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বেকার অবস্থায় আছেন।

অন্য সবার থেকে তাদের জীবন যুদ্ধ অনেক বেশি কষ্টকর। তারা কাজ করতে চান এবং চেষ্টাও করেন। তাদের সুযোগ প্রয়োজন। প্রতিবন্ধীতা সাপেক্ষে যে কাজ যে ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করতে পারবেন বা যে কাজে তাদের দক্ষতা রয়েছে সেই কাজটিই দেয়া প্রয়োজন। এতে কাজের দক্ষতা ও গতি দুই-ই বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের কাছে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত রয়েছে কিন্তু আমরা তাদের সুযোগ করে দিতে পারছি না। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যদি একসাথে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করে তাহলে তাদের কর্মের সুযোগ আরো বিস্তৃত হবে। তাদের জীবনমান উন্নয়ন হলে তারাও সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অফিসে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মরত আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি আমাদের সাথে হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী একজন নারী কর্মীর পরিচয় করিয়ে দেন। তার সাথে কথা বলে আমরা জানতে পারি, তিনি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনে গত ৯ বছর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছেন। নাজরানা ইয়াসমিন হীরা আমাদেরকে বলেন, আমাদের অফিসের লোক সংখ্যা অনেক কম তবে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথাটি সবসময়ই বিবেচনা করি।

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

সরকারি প্রকল্প কর্মকর্তা ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

এই সমাজের মানুষের কাছে একটা প্রশ্ন করতে খুব ইচ্ছা হয় - 'প্রতিবন্ধী মানুষগুলো তো এমনিতেই প্রতিবন্ধীতার শিকার, তার উপর তাদের এত প্রতিবন্ধকতা কেন?'

আমি বিশ্বজিৎ বিশ্বাস এক সময় সম্পূর্ণ দৃষ্টিমান (অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি) ছিলাম। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ালেখা করি তখন গাছে উঠতে গিয়ে হঠাৎ মাটিতে পড়ে মাথায় আঘাত পাই। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে হঠাৎ ধীরে ধীরে দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে সুচিকিৎসার জন্য দেশ ও দেশের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা গ্রহণ করি। সেখানে চোখের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষে চিকিৎসকরা বলে দিলেন, আমার চোখের সকল চিকিৎসা শেষ। তারা পরামর্শ দিলেন চোখের দৃষ্টির উপর চাপ না দিতে অর্থাৎ লেখাপড়া না করতে বলে দিলেন, লেখাপড়া করলে নতুন করে অন্যান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আমি যখন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিতে পরিণত হলাম তখন আমার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ ১৪ বছর আমি লেখাপড়া বন্ধ রেখেছি। কারণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পদ্ধতি আমার জানা ছিলো না। এ ব্যাপারে আমার পরিবারেরও কোন আগ্রহ ছিলো না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পড়ালেখা এমনকি তাদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে এই বিষয়েও আমি কিছুই জানতাম না।

অবশেষে ২০১৩ সালে আমার এক শুভাকাঙ্খী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লেখাপড়া-চাকরি বিষয় সমূহ নিয়ে আমাকে অবগত করেন। তখন আমি প্রতিবন্ধীতাকে উপেক্ষা করে বাইরের জগতে বের হলাম। ব্রেইল ও বিশেষ টকিং (এনভিডিএ) সফ্টওয়ারের সাহায্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিলাম। চাকরির জন্য অনেক সংস্থায় আবেদন করতাম, অনেকের কাছেই চাকরির জন্য অনুরোধ জানাতাম। লক্ষ্য করতাম, পরিপূর্ণ দৃষ্টিশক্তি থাকার পরও অনেক মানুষের দূরদৃষ্টির কতটা অভাব। আমি উপলব্ধি করলাম, যদিও আমি অনেক কিছুই জানি এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনে যথেষ্ট সক্ষম তবুও আমার দৃষ্টিহীনতার কারণে অনেকেই আমাকে যোগ্য মনে করেনি। ফলে আমি কিছু করে দেখানোর সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এটা আমার জন্য সত্যিই হতাশাজনক ছিল যে একটি সুযোগের অভাবে আমি সফল হতে পারছিলাম না। তবু আমি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছিলাম।

অবশেষে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট আমাকে সেই সুযোগ দেয়। ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর ইকোনোমিক এন্ড সোশ্যাল জাষ্টিস প্রোগ্রামে (সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগ পেলাম। আমাকে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রায় ২ বছর পর আমার অন্যত্র পোষ্টিং হয়। পোষ্টিং এলাকায় পরিবারের সকল সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমার পরিবারের কিছু সদস্য আমার জন্য বাধা সৃষ্টি করে চলেছে।

২০১৫ সালে চাকরি পাওয়ার পর পরিবার থেকে আমাকে বিয়ের কথা বলা হয়। সকল দায়িত্ব নেয়ার অঙ্গীকার দিয়ে পরিবার আমাকে বিয়েতে রাজি করায় এবং আমি স্বল্প বেতন হলেও একটি চাকরি করি এই সাহস নিয়ে বিয়েতে সম্মতি দেই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, বিয়ের ২/৪ মাসের মধ্যে পরিবারের সদস্যরাই আমার জন্য বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। অন্যায়ভাবে আমাকে তারা নানা বিপদে ফেলেছে। প্রতিনিয়ত আমাকে মানসিকভাবে আঘাত করছে এবং আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

আমাকে অনেকেই বলেছিল আমি কিছু করতে পারবো না, প্রতিবন্ধী মানুষেরা কিছু করতে পারেনা। আমি পেরেছি, আমি সমস্ত বাধা উপড়ে ফেলে দেখিয়ে দিয়েছি একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ অপ্রতিবন্ধী মানুষের সাথে একসাথে এগিয়ে যেতে পারে। আমি যদি কিছুই করতে না পারতাম তাহলে দেশ ও সমাজের বোঝা হতাম। এটি সবার জন্যই লজ্জার। এই লজ্জা পরিবার এবং সমাজ মেনে নিতে চায় না। আজ প্রতিবন্ধী মানুষ হয়েও এগিয়ে যাওয়ার পথে আমাকে আরও বেশি বাধা দেয়া হচ্ছে। সমাজের কটু দৃষ্টি আমার চলার পথকে কঠিন করে, আমাকে থামিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এ কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে জয়ী হয়ে ওঠাতেই আমার সার্থকতা।

৮.৬ আইসিডিডিআরবি

আইসিডিডিআরবি বিশ্বের একটি অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি মূলত স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশ্বের দরিদ্রতম জাতির স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণই তাদের লক্ষ্য। প্রাথমিকভাবে ডায়রিয়া নিয়ে কাজ শুরু করলেও তারা বর্তমানে অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের জন্য কাজ করছে।

আইসিডিডিআরবি থেকে জানা যায়, তারা নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতাকেই বিবেচনা করেন। কাজেই লিঙ্গ বা প্রতিবন্ধীতার ভিত্তিতে বৈষম্যের কোন প্রশ্নই নেই। তবে হিজড়া ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য তাদের কোন পৃথক নীতিমালা নেই। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলোকে মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য আইসিডিডিআরবি কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে শর্ত শিথিল করে। যেমন- কারো যদি শিক্ষাগত যোগ্যতা কম হয়, কিন্তু হিজড়া জনগোষ্ঠীর সাথে কাজের অভিজ্ঞতা থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে আইসিডিডিআরবি হিজড়া কমিউনিটির মধ্যে এইচআইভি প্রতিরোধে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় কিছু হিজড়া কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের সহযোগী সংস্থার সহায়তায় আইসিডিডিআরবি নিয়মিত ফলোআপ করে থাকে।

৮.৭ ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)

ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)'র উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে 'এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ'এর সহায়তায় সীতাকুন্ড থানায় সীতাকুন্ড পৌরসভা ও মুরাদপুর ইউনিয়নে ৫০০০ পরিবারের উপর এক জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। ফলাফলে ৫০০০ পরিবারে মোট ২৮,২৭১ জনের মধ্যে ৫,৫১৩ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সনাক্ত করা হয়, যা সীতাকুন্ডের মোট জনসংখ্যার ১৭.৭২%।

প্রতিবন্ধীতার এত উচ্চ হারের কারণগুলো বিশেষভাবে বিবেচনাধীন রেখে প্রথমে ইপসা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাঠ পর্যায়ে 'প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন শুরু করে। কেননা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজে নানাভাবে অবহেলিত ও বৈষম্যের শিকার। তাদের প্রতি পরিবার ও সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে সামগ্রিক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারীত্ব নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ইপসা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরি/কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সকলের ইতিবাচক মানসিকতা থাকে না এবং তাদের অগ্রাধিকারও দেয়া হয় না। আবার দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যে পরিমাণ বেতন, বোনাস বা অন্যান্য সুবিধাদি দেয়া প্রয়োজন সে অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা কম। এ বিষয়ক তহবিলও সেভাবে পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে, যথাযথ দক্ষ বা যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর অপ্রতুলতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতার অভাব তাদের চাকরি/কর্মসংস্থানের পথে অন্তরায়।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান বলেন, ইপসা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মপোযোগী করে গড়ে তোলার জন্য চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা প্রদানের ফলে এক সময় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ চাকরী, ব্যবসা ইত্যাদির জন্য দক্ষ ও যোগ্য হয়ে উঠেন। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ প্রদানই নয়, তাদের চাকরি/কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুপারিশ করা হয়। চাকরীতে কাজের পরিবেশ, সহকর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্থায় অগ্রাধিকার প্রদান, কোটা রাখা, অবকাঠামোগত অসুবিধাসহ নানা সীমাবদ্ধতা দূর করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত কাজ ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আমরা কাজ করি। চাকরিতে যোগদানের পর তাদের নিয়মিত ফলোআপ করা হয়। প্রতিবন্ধী নাগরিকদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষার জন্য সংস্থার পক্ষ হতে একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ফলোআপ কার্যক্রম চলমান থাকে। আমরা চেষ্টা করি কর্মজীবি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন কোন ভাবেই কর্মক্ষেত্র থেকে ঝরে না পড়ে। চাকরি পাবার অনিশ্চয়তার কারণে যেন তারা জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে না ফেলে এ কারণেই আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি/কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান করি।

শ্যামলী রানী দাস, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, অগ্রপথিক প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা

আমি তৃণমূল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ২০০৫ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছি। আমার কর্ম এলাকা মূলত ঢাকা। তৃণমূল প্রতিবন্ধী মানুষগুলো অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করে। আমাদের সমাজে নারীরা অত্যন্ত অবহেলার শিকার, আর সেই নারী যদি প্রতিবন্ধী হন তাহলে তার জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই মানুষগুলোকে পরিবার থেকেই অবহেলা করা হয় এমনকি মৌলিক অধিকারসমূহ থেকেও তারা বঞ্চিত হন।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে যারা বিত্তবান তারা ঘরে বন্দি জীবন যাপন করে আর যারা তৃণমূল বা হতদরিদ্র পরিবারের তারা ভিক্ষাবৃত্তি করে। তাদের উপার্জনের অর্থে সংসার চলে কিন্তু ঐ প্রতিবন্ধী মানুষটির জীবনমানের কোন উন্নয়ন হয় না এমনকি কোন ধরণের সুবিধাও সে পায় না। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক যে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রদান করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্য সেই সুবিধা ভোগ করে।

সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যদি কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষত প্রতিবন্ধী নারী চাকরি/কর্মসংস্থানের জন্য বের হয় তখন তাকে বিভিন্ন ধরণের হয়রানির শিকার হতে হয়। প্রবেশগম্যতার অভাব, সামাজিক কটু দৃষ্টিভঙ্গী, গণপরিবহনে যৌন হয়রানি, কর্মস্থলে সহকর্মীদের অসহযোগিতাসহ বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন তাকে হতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শারীরিক, দৃষ্টি এবং বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী নারীরা এ ধরণের অনভিপ্রেত ঘটনার শিকার হন। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এরকম পরিস্থিতিতে নারীরা সঠিক আইনি সহায়তাও পান না। আবার অনেকে ভয়ে ও পারিবারিক চাপে পিছিয়ে যান। প্রতিনিয়ত অনেক নারীই নিরাপত্তা ও প্রবেশগম্যতার অভাবে কর্মস্থল হতে ঝরে পড়ে। পরিবারগুলোও প্রতিবন্ধী নারীকে ঘরের বাহিরে বের হতে দিতে নিরুৎসাহিত হন।

কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। প্রতিবন্ধী নারীদেরও সমাজের আর সকলের মতো সমান নাগরিক অধিকার উপভোগের অধিকার রয়েছে। কিন্তু তাদের কথা অনেকেই বিবেচনা করেন না। অথচ মানসিকতার পরিবর্তন ও সামান্য কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়নই তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে। শুধুমাত্র নিয়োগ নয়, সকল ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধী নারীদের সুবিধা এবং অসুবিধার বিষয়টি চিন্তা করা প্রয়োজন। তবে তাদের জন্য যেকোন উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে তাদের কাছ থেকেই তাদের প্রয়োজনীয়তা ও অসুবিধাগুলো জেনে নিতে হবে, যাতে উদ্যোগসমূহের প্রকৃত সুবিধা তারা পান। নতুবা সফলতা আসবে না এবং তারা সমাজে অন্তর্ভূক্ত হবেন না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতেও কাজের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন।

৮.৮ অফিস পরিদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছেন, কাজেই অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না। ফলে কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে ও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। সেই সাথে হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যেন উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হয়, সেলক্ষ্যেও তারা কাজ করে। কিছু প্রতিষ্ঠান সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর অধিকার আদায়ে আইনী সহায়তা নিশ্চিত করার জন্যও কিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে। গবেষণাকালে যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিটিতেই হিজড়া বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

তবে এ সকল কার্যক্রমের অধিকাংশই সংঘটিত হয় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায়। প্রকল্প বাস্তবায়নে দাতা সংস্থার শর্তানুযায়ী হিজড়া বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাদের কর্মের সুযোগও শেষ হয়ে যায়। প্রকল্পভিত্তিক এ নিয়োগ কোন স্থায়ী সমাধান নয়। কারণ পরবর্তীতে তারা আবার বেকারত্বের শিকার হয়ে একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন। অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই বলা হয় যে তারা নিয়োগে কোন বৈষম্য করেনা। চাকরির যোগ্যতার শর্ত পূরণ হলে তারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধীতা নির্বিশেষে নিয়োগ দেন। একটি কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন- যদি সত্যিই নিয়োগ প্রক্রিয়া বৈষম্যহীন হয়ে থাকে, তবে কর্মীদের মধ্যে হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংখ্যা এতো কম কেন? আমরা সকলেই জানি, সামাজিক নানান বাধার কারণে হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে চাকরির জন্য নিজেদের যোগ্য করে তোলা অত্যন্ত কঠিন। এক্ষেত্রে তাদের জন্য শর্তাবলী কিছুটা শিথিল করা প্রয়োজন। সরকার থেকে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই যদি হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি নির্দিষ্ট কোটা বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে এ মানুষগুলোর চাকরির সুযোগ সৃষ্টি সহজ হবে।

জীবনধারণের জন্য অর্থ উপার্জনের কোন বিকল্প নেই। সম্মানজনক জীবিকা প্রতিটি মানুষের অধিকার। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় **১১** হাজার হিজড়া ব্যক্তি ও মোট জনসংখ্যার প্রায় **১৫%** প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছেন। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করা হলে তারাও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

৯. বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মতামত

সমাজে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা স্বত্বেও কিছু প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন যারা সমাজ পরিবর্তনে এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছেন। আবার এমন মানুষও আছেন যারা কোন প্রতিবন্ধীতার শিকার না আবার হিজড়া ব্যক্তিও না। কিন্তু এ মানুষগুলোর কঠোর জীবন সংগ্রাম দেখে তাদের জন্য কিছু করার প্রয়াস থেকে কাজ করে চলেছেন। এ গবেষণায় এরকমই কিছু মানুষের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.১ মর্জিনা আক্তার, প্রতিষ্ঠাতা, ডিজেবল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

ডিজেবল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-এর প্রতিষ্ঠাতা মর্জিনা আক্তার বলেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সফলভাবে কোন কাজ করতে হলে এবং সেখানে টিকে থাকতে হলে অনেক সংগ্রাম করতে হয়। এর প্রধান কারণ হলো, তাদের প্রতি মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথমেই মনে করা হয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কোন কাজ করতে পারবে না, তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু যথাযথ পরিবেশ, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ পেলে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে- এ কথা অনেকেই বোঝেন না। আমাদের সমাজের মানুষের মন-মানসিকতার পরিবর্তন হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন অনেক সহজ হতো।

তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যদি কষ্ট করে শিক্ষা অর্জনের পর চাকরিতে প্রবেশ করে, সেখানেও তাদের অধিকার খর্ব করা হয়। অবকাঠামোগত প্রবেশগম্যতার অভাব, সহকর্মীদের বিরূপ আচরণ, সর্বোপরি বেতন বৈষম্যের কারণে তারা চাকরি করায় নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এ সমস্যাগুলোর সমাধান হলে এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ দেয়া হলে তাঁরাও কাজের দক্ষতা দেখাতে পারবে।

প্রতিকূলতা থাকা স্বত্বেও অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা চাকরি করছে। তাছাড়া তাদের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। কিন্তু সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা অর্জন, কর্মসংস্থানসহ প্রতিটি মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত হলে, আমাদের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

৯.২ সালমা মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক, প্রতিবন্ধী নাগরিক সংগঠনের পরিষদ (পিএনএসপি)

প্রতিবন্ধী নাগরিক সংগঠনের পরিষদ (পিএনএসপি) এর সাধারণ সম্পাদক সালমা মাহবুব বলেন, দীর্ঘ দিন ধরে পিএনএসপি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি/কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করে আসছে। আর এ সহযোগিতা করতে গিয়ে আমরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী পরিবেশ না থাকা এবং তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বল্পতা অন্যতম। যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা জীবনের শুরু থেকেই অবহেলার শিকার হন, কাজেই অধিকাংশই লেখাপড়ার সুযোগ সেভাবে পান না। আবার অনেকে সুযোগ পেলেও মানুষের কটুক্তির কারণে পড়ালেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদি অনেক সংগ্রাম করে একটি চাকরিতে নিয়োগ পান তবে সেখান থেকে তার অন্য একটি যুদ্ধ শুরু হয়। কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় নেয়া অত্যন্ত জরুরি। যেমন- তার সহকর্মীরা হয়তো তার সাথে অসহযোগিতামূলক আচরণ করে অথবা তাকে কটুক্তির শিকার হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কর্মস্থলটি তাদের জন্য প্রবেশগম্য হয় না। ফলে নিয়োগ পাবার পরেও কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় তারা চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়। এক্ষত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির কোন সমস্যা আছে কিনা বা কি ধরণের সমস্যা হচ্ছে সে ব্যাপারে নিয়োগদানকারি প্রতিষ্ঠান যদি নজর দেয় তাহলেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে আগ্রহ তৈরি হবে এবং এই বিরাট জনগোষ্ঠী মানব সম্পদে রূপান্তরিত হবে।

হিজড়া ব্যক্তিদের বিষয়ে তিনি বলেন, তারাও আমাদের সমাজেরই একটি অংশ। হিজড়া ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের সমাজের মানুষের একটা ভীতি কাজ করে। তাই প্রথমেই তাদের আচরণগত পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি তাদের ধৈর্য্যশীল হতে হবে। হিজড়া ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে-এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। আচরণগত পরিবর্তন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পর কিছু মানুষকে চাকরি বা অন্যান্য কর্মসংস্থানের আওতায় নিয়ে আসা হলে ধীরে ধীরে তাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হবে। ফলে কর্মক্ষেত্রেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মত তাদের শারীরিক কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তারা সুযোগ পেলেই কর্মক্ষেত্রে নিজেদেরকে তুলে ধরতে সক্ষম।

৯.৩ সামিহা আফরিন, প্রকল্প পরিচালক, নারীপক্ষ

১৯৮৩ সাল থেকে নারীপক্ষ কাজ শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি নারীর প্রতি সহিংসতা, বৈষম্য এবং অবিচার দূরীকরণে কাজ করে। এ লক্ষ্যে তারা যৌনকর্মী, নিরক্ষর, শিক্ষিত এবং প্রতিবন্ধী নারীদের চাকরি/কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করেন। প্রতিষ্ঠানটির প্রকল্প পরিচালক, সামিহা আফরিন বলেন, আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নারীদের জন্য বিশেষত প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। যদি কোন হিজড়া বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাকরি হয়েও যায়, কিছু দিন পরেই সে চাকরি ছেড়ে দেয়। বেতন বেষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, সহকর্মীদের বিদ্রূপ ও অসহযোগিতা ইত্যাদি তাকে এ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করে । কিন্তু আমরা যদি সামগ্রিক উন্নয়ন চাই, তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে, কাউকে পেছনে ফেলে রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষেরই সম্মানজনক উপার্জনের মাধ্যমে বাঁচার অধিকার রয়েছে আর অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়টি নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান। হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে চাকরি/ কর্মসংস্থানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। তাদের যেন কারো দয়ার উপর নির্ভরশীর হতে না হয় বরং তারা যেন সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগে সহযোগিতাপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদের যদি সুযোগ দেয়া না হয়, তাহলে তারা কখনোই নিজেদের প্রমাণ করতে পারবে না।

বর্তমানে নারীপক্ষে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নারী কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি/কর্মসংস্থান প্রাপ্তি প্রত্যেকের অধিকার। কিন্তু চাকরি দেয়াই শেষ নয়, কর্মস্থল যেন কাজ করার উপযোগী হয় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশে যে সকল হিজড়া বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি/কর্মসংস্থান হয়েছে আমরা নিয়মিত তাদের খোঁজ খবর রাখি, যেন তারা কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে আমরা সমাধান করতে পারি।

১০. সফলতার গল্প

আমাদের সমাজে একজন প্রতিবন্ধী বা হিজড়া ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে সামনে এগোতে হয়। কেউ তাদের বোঝা মনে করে- কেউবা তাদের পাপের ফসল মনে করে ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু সমান সুযোগ পেলে এ মানুষগুলোও কিছু করে দেখাতে পারে। সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সকল বৈষম্যকে পেছনে ফেলে সফলতা অর্জন করেছেন এমনই দুজন মানুষের গল্প এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

১০.১ ভাস্কর ভট্টাচার্য্য, এক্সেসেবেলিটি কনসালটেন্ট, এটুআই

ভাস্কর ভট্টাচার্য্য একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। শিক্ষা জীবন থেকেই তিনি তাঁর মেধা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সরব ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি সকল মহলের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

নিজেকে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে তিনি জাপান, থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়া, ফিলিপাইন, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো, তুরস্কসহ পৃথিবীর প্রায় ৩০টিরও বেশী দেশে তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রবেশগম্যতা নিয়ে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান ও গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও তিনি জাতিসংঘসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে বিশেষ বক্তা হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন ও গবেষণা কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

ভাস্কর ভট্টাচার্য্য পেশাগত দায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রামের প্রখ্যাত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা) তে যোগদান করে নিজের কর্মদক্ষতাকে বিস্ময়করভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সফল হন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিকাশে তথ্য প্রযুক্তিকে সহজ ও সার্থকভাবে উপস্থাপন করে আসছেন। কম্পিউটার ব্যবহারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে নিজেকে একজন দক্ষ শিক্ষক হিসেবে তেরি করে আজ দেশে ও বিদেশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সফল হয়েছেন। এছাড়াও তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এঅঅএঞউঝ (Global Alliance on Accessible Technologies & Environments) এর দেশীয় প্রতিনিধি ও সহ-সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশে কর্মরত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পরিচালিত Access to Information (A2I) কার্যক্রমে পরামর্শক হিসাবে কাজ করেছেন এবং বর্তমানে আইসিটি অধিদপ্তরের আওতায় এটুআই কার্যক্রমে এক্সেসেবেলিটি কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।

একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়েও ভাস্কর ভট্টাচার্য্য তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের সাহায্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সরকারি, বেসরকারি ও সুশীল সমাজের সর্বোচ্চ মহল থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজেকে এক সফল প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এছাড়াও তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির সকল পাঠ্যপুস্তককে ডিজিটাল টকিং বইয়ে পরিণত করা, এক্সেসেবল ডিকশনারী তৈরি করা ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫ হাজার ওয়েব সাইট যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ব্যবহার করতে পারে এজন্য এটুআই এর সাথে বিশেষজ্ঞ পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন।

২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে একজন সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে তিনি জাতীয় সম্মাননা গ্রহণ করেন। তার অন্যান্য আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- জিরো প্রজেক্ট এ্যাওয়ার্ড ২০১৬ অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা, ইন্টারন্যাশনাল এ্যাক্সেসেবল পাবলিশিং এ্যাওয়ার্ড ২০১৪ লন্ডন বুক ফেয়ার, আইএসআইএফ এশিয়া এ্যাওয়ার্ড তুরস্কের ইস্তাম্বুল ইন্টারন্যাশনাল গর্ভনেন্স ২০১৩, মাইক্রোসফট ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড কলম্বো ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ এবং সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড উদ্ভাবনী এ্যাওয়ার্ড, হেনরি ভাস্কার দি এ্যাওয়ার্ড ২০১৭ আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি। তার উদ্ভাবিত মাল্টিমিডিয়া টকিং বুকের জন্য ডাব্লিউএসআইএস পুরস্কার পায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এটুআই প্রোগ্রাম।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার এবং ডেইজি টকিং বুকের মাধ্যমে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারে এই জন্য তিনি পাঁচ শতাধিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির হাতে স্মার্ট ফোন তুলে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার্য তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও জার্নালে নিয়মিত ভাস্কর ভট্টাচার্য্য এর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করতে নিয়মিত বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করে থাকেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন।

১০.২ অনন্যা বণীক, উদ্যোক্তা

হিজড়া ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সফল নাম অনন্যা বণীক। তিনি বলেন, আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা পুরান ঢাকাতে। ৮ম শ্রেণীতে পড়াকালীন আমি নিজের মধ্যে মেয়েসুলভ আচরণ লক্ষ্য করি। যদিও এলাকার মানুষ আমাকে এ আচরণের কারণে বিভিন্ন কটু কথা বলতো, কিন্তু আমার পরিবার তখন আমার প্রতি খুবই ইতিবাচক ছিল। তাই আমাকে পড়ালেখার পাশাপাশি নাচের স্কুলে ভর্তি করে দেয়। কিন্তু সেখানেও আমাকে বিভিন্ন নেতিবাচক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়।

আমি যখন এইচএসসি পরিক্ষার্থী তখন আমার বাবা মারা যান এবং সংসারের দায়িত্ব চলে যায় আমার বড় ভাইয়ের কাছে। আমার মেয়ে সুলভ আচরণ ভাই মেনে নিতে পারেনি। শুরু হয় আমার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। আমাকে ঘর থেকে বের হতে দেয়া হতো না এবং আমাকে দিয়ে ঘরের সমস্ত কাজ করানো হতো। এভাবে চলতে চলতে একদিন আমার ভাইয়ের এক বন্ধু তার স্টুডিওতে সপ্তাহে ৫০০ টাকা (পাঁচশত) বেতনে আমাকে ম্যানেজারের দায়িত্ব দেন। সেখান থেকেই শুরু হয় আমার কর্ম জীবন। এরই মধ্যে আমি বন্ধু ওয়েল ফেয়ার সোস্যাইটির কথা জানতে পারি। সেখানে আমি চাকরির সুযোগ পাই এবং আমার দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করি। আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতাম। "আইসিডিডিআরবি" নামক একটি প্রতিষ্ঠান আমার কাজে খুশি হয়ে আমাকে সেই অফিসে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। এই ভাবেই আমার দিন চলতে থাকে। একটা সময় আমি ভেবে দেখলাম শুধু আমি নই, আমার মত আরও অনেকে রয়েছে যাদের নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন। তখন থেকে আমি উদ্যোক্তা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই এবং একটি পার্লারের ব্যবসা শুরু করি।

প্রথম দিকে আমাকে আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। দোকান পাওয়া থেকে টিকে থাকা পর্যন্ত আমি অনেক কষ্ট করেছি। তবে আমার এই যুদ্ধের সাথে কিছু প্রশাসনিক ব্যক্তি যদি সহযোগিতা না করতেন তাহলে মনে হয় আমার সব কষ্টই বিফলে যেত। এখন আমি একজন সফল উদ্যোক্তা এবং প্রায় ১২০ জন হিজড়া ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। আমার পার্লারের আরও দুটি শাখা আছে, সেখানে হিজড়া ব্যক্তিরা কাজ করে এবং প্রশিক্ষণ নেয়।

১১. সফল হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক উদাহরণ

প্রতিবন্ধী ও হিজড়া ব্যক্তিরা সামান্য সুযোগ পেলেই জীবনে অনেক বড় কিছু অর্জন করতে সক্ষম। এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত। এরকমই একটি নাম স্টিফেন হকিং। তিনি এক প্রকার মোটর নিউরন রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং বাকশক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে তিনি চলাফেরা করতেন হুইলচেয়ারের সাহায্যে এবং এক ধরণের শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্রের সাহায্যে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতেন। কিন্তু তিনি একজন বিশ্বখ্যাত তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ। তার নিজের তত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে রচিত 'আ ব্রিফ হিস্টোরি অব টাইম' একটি রেকর্ড সৃষ্টি করা বই। এ বইটি ২৩৭ সপ্তাহ ব্রিটিশ সানডে টাইমসের সর্বোচ্চ বিক্রিত বই এর তালিকায় ছিলো।

নিক ভুইয়িচিচ- একাধারে একজন চিত্রশিল্পী, সাঁতারু, স্কাইডাইভার এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তা। বিরল টেট্রা-আমেলিয়া সিনড্রোম এর কারণে চার হাত - পায়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্ম হয়। নিজের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তিনি বর্তমানে একটি পরিচিত নাম। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি লাইফ উইদাউট লিম্বস নামে নিজের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করেন।

অটিজমে আক্রান্ত হলেও স্টিফেন উইল্টশায়ার একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। লন্ডনে তার নিজস্ব আর্ট গ্যালারী রয়েছে। তাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্রও তৈরি হয়েছে। উইল্টশায়ারের স্মৃতি শক্তি অসাধারণ। কোন জিনিস মাত্র একবার দেখেই তিনি স্মৃতি থেকে তার ছবি আঁকতে পারেন। একবারই মাত্র প্লেনে করে মেক্সিকো সিটির উপর দিয়ে যাওয়ার পরে ১৩ ফুট ক্যানভাসের উপর তিনি শহরটির একটি ছবি আঁকেন।

রেটিনার ক্যান্সারে আক্রান্ত বেন আন্ডারউড ছোটবেলাতেই দৃষ্টিশক্তি হারান। কিন্তু তিনি জিহ্বা দিয়ে শব্দ করে প্রতিধ্বনির মাধ্যমে চলাচল করতেন। শুধু চলাচলই নয়, তিনি বাস্কেটবল, ফুটবল খেলা, দৌড়ানো, সাইকেল চালানোসহ বিভিন্ন কাজ একইভাবে করতেন।

আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতেও আমরা কিছু চমৎকার উদাহরণ দেখতে পাই। ভারতের অরুণিমা সিনহা একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ট্রেন থেকে কিছু দুর্বৃত্ত তাকে ফেলে দিলে তিনি একটি পা হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু একটি পা নিয়েই তিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণ করেছেন। মুনিবা মাজারী একজন পাকিস্তানি অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তা, চিত্রশিল্পী, মডেল, টেলিভিশন উপস্থাপক এবং তিনি একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী।

হিজড়া ব্যক্তিরা ভারত, আমেরিকা ছাড়াও বিভিন্ন দেশ আরো রাজনীতিসহ বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত আছেন। ঋতুপর্ণ ঘোষ ছিলেন ভারতের এলজিবিটি সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম মেধাবী ও গুণী নির্মাতার আসনে তিনি যেমন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনি ব্যক্তি জীবনের আচরণ দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের হাজার বছরের প্রচলিত ঘুণে ধরা ভাবনা। তিনি বলতেন, শিল্পীর কোনো জেন্ডার হয় না। তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিটি ধাপেই অর্জন করেছেন বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান ও দর্শকদের অগাধ ভালোবাসা। তার প্রতিটি চলচ্চিত্রেই রয়েছে সুগভীর চিন্তার ছাপ আর চরিত্র রূপায়নে রয়েছে ভিন্নতার দাবী।

আলী সালিম একজন পাকিস্তানি টেলিভিশন হোস্ট, অভিনেতা এবং চিত্রনাট্যকার। বেগম নওয়াজীশ আলী হিসেবে তার অধিক পরিচিতির কারণ হলো তিনি পুরুষ আলী সালিম হিসেবে খুব কমই পর্দায় উপস্থিত হন। তিনি কখনও কখনও নিজেকে সমকামী, উভকামী এমনকি হিজড়া বলেও অভিহিত করেছেন।

অপ্সরা রেড্ডিকে ভারতের কংগ্রেস পার্টি সম্প্রতি হিজড়া কর্মী? মহিলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পদে নিয়োগ দিয়েছে। দলটির ১৩৪ বছরের ইতিহাসে তিনিই প্রথম হিজড়া অফিসার। রাজনীতিতে প্রবেশের আগে রেড্ডি সাংবাদিক এবং হিজড়া কর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন। ড্যানিকা রোম একজন আমেরিকান সাংবাদিক এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাজনীতিবিদ। ২০১৩ সালের ভার্জিনিয়া নির্বাচনে তিনি ভার্জিনিয়া হাউস অফ ডেলিগেটসে নির্বাচিত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে জেলা পরিষদ ও সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হন। তিনি ভার্জিনিয়া জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচিত প্রথম হিজড়া ব্যক্তি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় প্রথম ট্রান্সজেন্ডার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন।

১২. সুপারিশমালা

বাংলাদেশে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনসংখ্যা হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। এ বিশাল জনগোষ্ঠী কর্মহীন হওয়ায় তারা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সমর্থ হচ্ছেন না। তাদের পেছনে ফেলে রাখায় প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দেশই পিছিয়ে থাকছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে। হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি/কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। কোন প্রতিষ্ঠান যদি হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়ে তাদের জন্য উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে তাহলে তারা অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য রোল মডেল হয়ে উঠবে এবং তাদের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে তেমনি হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও নিজেদের যোগ্য করে তুলতে হবে এবং চাকরি করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। উভয় দিক থেকে সহযোগি মনোভাব থাকলেই সফলতা আসবে।

প্রতিষ্ঠানের জন্য (হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে)

১. প্রথমেই কাজে অসমর্থ না ভেবে তাদের সুযোগ দেয়া।

২. হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়ার পূর্বে তাদের জন্য উপযোগী কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৩. যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী চাকরি দেয়া।

৪. চাকরি থেকে ঝরে পড়া রোধে কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং সহযোগিতার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা ও সহায়ক কাজের উপকরণ নিশ্চিতকরণ।

৫. সময়োপযোগী বেতন নিশ্চিতকরণ।

৬. যেহেতু হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সেভাবে লেখাপড়ার সুযোগ পান না, তাই নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি কিছুটা শিথিল করা।

৭. নিয়োগ দেয়ার পূর্বেই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মীদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশন দেয়া।

৮. কোন প্রতিবন্ধী ও হিজড়া ব্যক্তির সাথে কাজ করতে অসুবিধা হলে, তাকে অবহেলা না করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা।

৯. দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে তাদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা এবং সহযোগিতাপূর্ণ দৃষ্টি দেয়া।

১০. প্রাতিষ্ঠানিক আচরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

১১. তাদের প্রতি, বিশেষত হিজড়া ব্যক্তিদের অবহেলিত জীবন যাত্রাকে বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রতি সহনশীল হওয়া।

১২. শুধু নিয়োগ দিলেই হবে না, তারা যাতে চাকরিতে টিকে থাকে এবং কোন বৈষম্যের শিকার না হয় সেজন্য নিয়মিত ফলোআপ করা।

১৩. হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ।

১৪. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ বাজেট নির্ধারণ।

১৫. বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ বিষয়ে কাজের পরিধি আরো বিস্তৃত করা।

১৬. সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করা দরকার।

১৭. নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে কেবল সমস্যাগুলো না ভেবে বরং তা থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিতকরণ।

১৮. শুধুমাত্র প্রকল্পভিত্তিক নিয়োগ অথবা দাতা সংস্থার চাহিদা পূরণের জন্য নিয়োগে আবদ্ধ না থেকে জীবনমান উন্নয়ন ও এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করার প্রয়াসে তাদের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি।

১৯. হিজড়া ও প্রতিবন্ধী নাগরিকদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষা এবং সামাজিকভাবে যোগাযোগ সমুন্নত রাখার জন্য একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তৈরি এবং এর মাধ্যমে সকল কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন ও এটি সক্রিয় রাখা।

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য (হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি)

১. লেখাপড়ার পাশাপাশি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন।

২. চাকরি করার মানসিকতা ও এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনোভাব পোষণ।

৩. চাকরি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মানসিকতা এবং চাকরিতে টিকে থাকার ক্ষেত্রে প্রত্যয়ী হওয়া।

৪. হিজড়া ব্যক্তিদের আচরণগত পরিবর্তন সাধন।

৫. চাকরি পাওয়ার পর সুষ্ঠুভাবে নিজের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

৬. কোন কাজকে ছোট না ভেবে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো।

৭. কর্মক্ষেত্রে সকলের সাথে মিলে মিশে কাজ করার মানসিকতা এবং মনোভাব তৈরি।

৮. যে সকল প্রতিষ্ঠান হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান নিয়ে কাজ করে, অনেক সময় হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই তাদের সহযোগিতা করেন না। এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কারণ তারা সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ না করলে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই তাদের উন্নয়ন করা সম্ভব নয়।

৯. নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমাজের প্রত্যেকেই যদি সচেষ্ট হয়, তাহলে পিছিয়ে পড়া এই মানুষগুলোর উন্নয়ন সম্ভব এবং তারাও সমাজের সকল স্তরে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

১৩. গবেষণার মাঠ কর্মীদের মতামত

দি ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীং বাংলাদেশ নিয়মিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্ন হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ গবেষণা কার্যক্রমের সাথে পিপল্স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে আগত ইন্টার্ন লুৎফুন নাহার মুন্নি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে আগত হৃদয় রতন আচার্য্য মাঠকর্মী হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এর মাধ্যমে তারা একটি ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাদের মতামত-

বিশ্বের সকল মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) গৃহীত হয়েছে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর সফলতার পর বাংলাদেশেও সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা সমূহ এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম যেমন- সচেতনতা ক্যাম্পেইন এবং সমাজসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দি ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে হাতে হাত রেখে সকলে একত্রিত হয়ে দেশের উন্নয়নই দি ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীং বাংলাদেশ-এর লক্ষ্য।

এসডিজির ৫নং লক্ষ্যমাত্রায় লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে এসডিজি-৮ এ সকলের জন্য শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নকে আরো গতিশীল করার জন্য দি ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীং বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করে সম্প্রতি 'হিজড়া এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে' একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ গবেষণায় আমরা গবেষণা সহকারী হিসেবে সহযোগিতা করার সুযোগ পেয়েছি।

গবেষণার আওতায় ঢাকা জেলার নির্দিষ্ট কিছু সংস্থার সহযোগিতায় শতাধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও শারিরীক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি) এবং শতাধিক হিজড়া ব্যক্তিদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় হিজড়া এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্দশা ও কঠোর জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারি। শুধুমাত্র সুযোগের অভাবে এবং সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে এ মানুষগুলো মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এ কথাটা মেনে নেয়া সত্যিই খুব কষ্টের। কোন না কোনভাবে আমাদের অবহেলাই তাদের এ দূরাবস্থার জন্য দায়ী।

আমাদের বিরূপ আচরণের কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কেউ গৃহবন্দী, কেউবা ভিক্ষাবৃত্তিতে সম্পৃক্ত। আর যে হিজড়া ব্যক্তিদের আমরা আচরণের জন্য এড়িয়ে চলতে চাই, তারা বঞ্চিত হতে হতে আজ বাঁচার তাগিদে হিংস্র হয়ে উঠেছেন। আমাদের একটু সহযোগিতা তাঁদেরকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে সহায়তা করতে পারে। এ সমাজের মানুষ হিসেবে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরও আছে। দক্ষতা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি/কর্মসংস্থানের সুযোগের মাধ্যমে তারাও পরিবার ও দেশের উন্নয়নে সমান ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

এ গবেষণাটিতে কাজ করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি, বাংলাদেশ সরকার যদি প্রতিষ্ঠানসমূহকে হিজড়া এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগদানের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয় ও তার যথাযথ মনিটরিং হয় তবে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর বেকারত্বের অভিশাপ দূর হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৈষম্যহীন একটি সুন্দর দেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

১৪. সার্বিক আলোচনা

আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আইন, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের সমান সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করা হলেও বাস্তবচিত্র একেবারেই ভিন্ন। জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বহুলাংশে পিছিয়ে আছেন। আইন তাদের স্বীকৃতি দিলেও এ সমাজের মানুষ তাদের গ্রহণ করেনি। ফলে শিক্ষা গ্রহণ, কর্মসংস্থানসহ প্রতিটি মৌলিক অধিকার থেকে তারা অনেকাংশেই বঞ্চিত। প্রতিনিয়ত তাদের কঠোর পরিশ্রম করে, সমাজের সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে অগ্রসর হতে হয়। স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা এখনও সফল হতে পারিনি।

আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বোঝা মনে করা হয়। প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রতি আস্থা রেখে তাদের নিয়োগে আগ্রহী হয় না। আবার নিয়োগ পেলেও প্রবেশগম্যতার অভাব, সহকর্মীদের বিরূপ আচরণ এবং প্রতিষ্ঠানের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে তারা ঝরে পরেন। হিজড়া ব্যক্তিদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তারা পরিবার থেকে বিতাড়িত এবং সমাজে অনাকাঙ্খিত। অধিকাংশই সম্মানজনক পেশার সাথে সম্পৃক্ত হতে না পেরে বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েন।

হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হলে তারা স্বাবলম্বী হয়ে একটি সম্মানজনক জীবন যাপনে সক্ষম হবে। একই সাথে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীং এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ। হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি বা কর্মসংস্থানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা এবং তাদের জীবন মান উন্নয়ন ও জীবন ধারণের জন্য চাকরির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সৃষ্টিই এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করার জন্য হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জরিপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহের জন্য স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (ব্র্যাক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, আশা, কেয়ার বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং সেভ দ্যা চিলড্রেন) ওয়েবসাইট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালা (বাংলাদেশের সংবিধান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা পত্র, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আর্ন্তজাতিক চুক্তি) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল থেকে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী এ দেশের প্রতিটি মানুষই সমান সুযোগ ও অধিকারের দাবিদার হলেও বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশেষত হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছেন। বর্তমান সামাজিক ও অবকাঠামোগত প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ একটি কষ্টসাধ্য বিষয়। ফলে প্রথমেই চাকরির বাজারে তারা পিছিয়ে যান অনেক খানি। তারপরও অনেকেই উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এবং সফলও হচ্ছেন। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলেই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা স্বত্বেও তাদের চাকরি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কাজের সুযোগ না পেয়ে অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তিতে সম্পৃক্ত হতে বাধ্য হয়েছেন। দেশের পরিবহণ ব্যবস্থা, সড়ক এবং গণস্থাপনাগুলোর অধিকাংশই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব না হওয়ায় প্রতিদিন কর্মস্থলে যাওয়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এছাড়া সহকর্মীদের অবহেলা, প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য ইত্যাদি কারণে তারা কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারেন না। কিন্তু এর মধ্যেই একটি ব্যতিক্রমী নাম ভাস্কর ভট্টাচার্য্য। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এ মানুষটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পরিচালিত Access to Information (A2I) কার্যক্রমে এক্সেসেবেলিটি কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।

হিজড়া ব্যক্তিরাও সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়ে শিক্ষাসহ সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। যারা লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত হন, তারা প্রায় সবাই অসহনীয় ব্যঙ্গ বিদ্রুপের শিকার হয়ে মাঝপথেই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। চাকরির জন্য নূন্যতম যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। আবার অনেকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের পরও শুধুমাত্র হিজড়া ব্যক্তি বলে চাকরি পাননি। এ সব নেতিবাচক আচরণকে পেছনে ফেলে খুব অল্প সংখ্যক হলেও হিজড়া ব্যক্তি অক্লান্ত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কেউ চাকরি করছেন আবার কেউবা চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের ব্যবসা। পাশাপাশি অন্যান্য হিজড়া ব্যক্তিদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য তারা কাজ করছেন। অনন্যা বণীক একজন সফল উদ্যোক্তা। তার ০৩টি পার্লার আছে এবং হিজড়া ব্যক্তিরা সেখানে প্রশিক্ষণ নেয়। তিনি বর্তমানে ১২০ জন হিজড়া ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছেন।

তবে ইতিবাচক বিভিন্ন উদ্যোগও রয়েছে। সরকার থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ভাতা প্রদান, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি হিজড়া ব্যক্তিদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ পরবর্তী হিজড়া ব্যক্তিদের ১০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়। কিন্তু টাকার পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ায় এবং যথাযথ মনিটরিং না থাকায় কাজটি ফলপ্রসূ হয় না। বেসরকারি পর্যায় থেকেও এ মানুষগুলোর চাকরি বা কর্মসংস্থানের কার্যক্রম রয়েছে। তবে অনেক সময়ই দাতা সংস্থার শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে হিজরা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রকল্প ভিত্তিক বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকল্প বা চুক্তি শেষ হয়ে যাবার পর এ মানুষগুলো একই সমস্যায় পড়েন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে আমরা দেখতে পাই তারা প্রত্যেকেই বৈষম্যহীনভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। অনেকেই সমাজে সমতা বা বৈষম্যহীন নিয়োগ প্রক্রিয়ার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই যদি হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগে এগিয়ে আসে এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন সম্ভব। উল্লেখ্য যে, যে সকল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট গবেষণার আওতায় পর্যালোচনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কর্মরত রয়েছে।

বাংলাদেশে হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি ও কর্মসংস্থান নিয়ে কাজ করছেন বা নিজেরাই নিয়োগ দিয়েছেন এমন কিছু প্রতিষ্ঠান এ গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় পরিদর্শন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আর্থিক সহায়তা, সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ, আইনী সহায়তা নিশ্চিতকরণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্কুল পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে ও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। সেই সাথে হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য যেন উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হয়, সে লক্ষ্যে ও তারা কাজ করে।

এ গবেষণাটি খুব সীমিত সংখ্যক হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে পরিচালিত হলেও তাদের প্রত্যেকের জীবনচিত্র ও সংগ্রাম একইরকম। তাদের প্রত্যেকেরই চাওয়া খুব সীমিত। তারা এদেশের নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকারের নিশ্চয়তা চান। শুধুমাত্র আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনই তাদের জীবনধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসবে। সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রবেশগম্যতা এবং বৈষম্যহীনতা- এ বিষয়গুলো নিশ্চিত হলেই তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থানসহ সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কোন না কোন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমরা যদি হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দিকে তীর্যক দৃষ্টি না দিয়ে বরং সহজভাবে গ্রহণ করি, তাহলেই তাদের জীবন অনেকটা সহজ হয়ে উঠতে পারে।

১৫. উপসংহার

পৃথিবীতে কোন মানুষই পরিপূর্ণ নয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কোন না কোন সীমাবদ্ধতা রয়েছে। হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের আর সকল মানুষের মতো নিজেকে গড়ে তোলার সমান সুযোগ পায় না। ফলে তারা সকল সীমাবদ্ধতা জয় করে কর্মসংস্থানের উপযোগী হয়ে ওঠে না এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে প্রথমেই ছিটকে পড়তে বাধ্য হয়। তখন পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে কোন রকমে জীবন ধারন ছাড়া তাদের অন্য কোন বিকল্প থাকে না।

সমাজের মানুষগুলো খুব সহজেই হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপহাস করে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও অবহেলা করে। কিন্তু তাদের সংগ্রামের কথা হাতেগোনা কিছু মানুষ ছাড়া কেউই উপলব্ধি করে না। আমরা যদি তাদের দিকে তীর্যক দৃষ্টি না দিয়ে বরং তাদের সহজভাবে গ্রহণ করি, তাহলেই তাদের জীবন অনেকটা সহজ হয়ে উঠতে পারে। কাজেই প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তনের। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ রয়েছে। এ উদ্যোগগুলো কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

প্রতিটি মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তথা স্বাবলম্বীতার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এজন্য চাকরি বা কর্মসংস্থান খুবই প্রয়োজন। কিন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যোগ্যতা থাকলেও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিজড়া ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগদানের ক্ষেত্রে আগ্রহী হয় না। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ হতে এ মানুষগুলোর কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাহলেই তারা বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

১৪. তথ্যসূত্র

- https://www.hrw.org/bn/report/2016/12/23/298116
- http://oporajeyo.com/2020/02/16/%e0%a7%a7%e0%a7%a6-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%80-%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%a8%e0%a6%bf/
- https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%9A
- https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%A8_%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%82
- https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Wiltshire
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Underwood
- https://en.wikipedia.org/wiki/Arunima_Sinha
- https://en.wikipedia.org/wiki/Muniba_Mazari
- https://www.indiatoday.in/movies/celebrities/story/rituparno-ghosh-paranoid-sexuality-165062-2013-05-31
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Saleem
- https://www.dw.com/en/indian-transgender-politician-apsara-reddy-i-want-to-be-looked-upon-as-an-equal/a-47168912
- https://en.wikipedia.org/wiki/Danica_Roem
- https://www.filmibeat.com/celebs/bobby-darling/biography.html

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

যৌথ প্রকাশনা

ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবীং বাংলাদেশ

১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২৪৯৩৫১৮
ই-মেইল: info@wbbtrust.org, ওয়েব: www.wbbtrust.org